এক সেকেন্ডের ঘুম

– আবিদ করিম মুন্না

প্রত্যেক মৃত্যুই আমাকে ছোট করে ফেলে, জিজ্ঞেস করো না কখনও ওই দুঃখের ঘণ্টাধ্বনি কার *মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করছে, তোমার জন্যই হয়তো বাজছে ওই ধ্বনি।*

মৃত্যু নিয়ে এই কথাগুলো হয়তো বিখ্যাত কোনো মনীষীর। কিন্তু কথাটি আমি প্রথম শুনেছিলাম বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেই জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *যদি কিছু মনে না করেন*–এর উপস্থাপক প্রয়াত ফজলে লোহানীর মুখ থেকে। কিংবদন্তির এই উপস্থাপক মৃত্যুর ঠিক আগের কোনো একটি অনুষ্ঠানে উপরে কথাগুলো বলেছিলেন। আজো মাঝে মধ্যে বিটিভির আর্কাইভ থেকে তাকে নিয়ে প্রচারিত অনুষ্ঠানে এই অংশটুকু দেখানো হয়।

পৃথিবীতে আমরা এসেছি সেই অচেনা জগতে চিরতরে ফিরে যেতে। মৃত্যু কাউকেই ছাড়বে না। এর হিমশীতল পরশ পেতে হবে সবাইকে একদিন আগে অথবা পরে। আমাদের এই যে হাসি, গান আর খেলা সব কিছুকে পেছনে ফেলে চলে যেতেই হবে পরপারের ডাক এলে। প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে মানুষ মারা যাচ্ছে। পাখিকে গুলি করার মতো মানুষই মারছে মানুষকে। কিছু কিছু মৃত্যুতে আমরা বিচলিত হই, মনে জাগে শিহরণ, কিছু কিছু মৃত্যুর খবর শুনে আমরা বিস্মিত হই। এ কি করে সম্ভব!

মানুষ মরে গেলে দ্রুত ভুলে যাওয়াই নিয়ম। তবুও কিছু কিছু মৃত্যুর কথা মানুষ ভুলতে পারে না কখনো। প্রতিক্ষণে ভাবে এমনটা তো নাও হতে পারতো। কিন্তু নিয়তি সহায় না হলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন তো করতেই হবে।

আমার মনে একটি মৃত্যুর কথা আজো রেখাপাত করে আছে।

১৯৯৮ সালের ২০ জানুয়ারি। ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি রোজা এবং ঈদুল ফিতরের ছুটি কাটাতে। সেই দিনটিতে আচমকা সুযোগ পেয়ে গেলাম রংপুর জেলা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগে খেলার। রোজা রেখেই খেলতে গিয়েছিলাম। আমাদের খেলা শেষে যখন পুরো দলসহ ক্লাব প্রাঙ্গণে বিকেলে ফিরে এলাম সেখানেই জানতে পেলাম সেই দুঃসংবাদ। সম্পর্কে আত্মীয় মাসুদুর রহমান চৌধুরী মাসুদ চাচা আর বেচে নেই। দুপুরে বাসায় ফেরার পথে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। সে অবস্থায় দেখতে গেলাম তার লাশ। তাজা রক্ত নাকে মুখে লেগে আছে।

নীরব–নিথর মাসুদচাচা ঘুমিয়ে আছেন গভীর ঘুমে চকিতে। তাকে নূরপুর কবরস্থানের শেষ বিছানায় যখন শুইয়ে দেয়া হলো, শুধু চেয়ে দেখছিলাম তার নয় বছরের ছেলে তানিমের দিকে। অপার বিস্ময়ে বাবাকে বিদায় জানাচ্ছিল সে।

সেই ছোট্ট ছেলে তানিমুর রহমান চৌধুরী এ বছরই জিপিএ–৫ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তার মেয়ে ইসরাত জাহান চৌধুরী কণাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন মাসুদচাচা একদিন সে ডাক্তার হবে। বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে ডাক্তারি পড়ছে ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজড মেডিকাল কলেজে। মাসুদচাচা তার ছেলেমেয়েদের কোনো সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না।

সেদিন মাসুদচাচা হয়তো বেচে যেতেও পারতেন। কিন্তু নিয়তির ওপর আমাদের সবাইকে যে মাথা নত করতেই হয়। সেই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর সড়ক দুর্ঘটনায় ভাগ্যক্রমে বেচে যাওয়া রুহুল আমিন বাবলুচাচার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আসলে কি ঘটেছিল?

তিনি বললেন, কুড়িগ্রামে ব্যবসায়িক কাজে রোজা রেখেই সকাল আটটায় বেরিয়েছিলাম আমি ও মাসুদভাই। রংপুর ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেলে। আমাদের মাইক্রোবাসের সিটবেল্ট বাধা ছিল না কারো। জোহরের নামাজ কি কারণে তিস্তা সেতু পার হয়ে আসবার পর কাউনিয়াতে আদায় করা হলো না। ভাবলাম রংপুর তো

আর মিনিট দশেকের রাস্তা। বাড়িতে গিয়েই পড়বো। পৌঁছে গেছি নবীগঞ্জে। দুপুর তখন আড়াই কি তিন ঠিক মনে নেই। মাসুদভাইয়ের একটু ঘুম পেয়েছিল। তিনিই ড্রাইভ করছিলেন। ড্রাইভিং করার সময় এক সেকেন্ডের ঘুম মানে অনেকটা সময়। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ ...। একটা ভ্যানকে সাইড ...। একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা ...। তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই।

সেন্ট্রাল রোড, রংপুর থেকে
abidkarimbau@yahoo.com

একজন বড় ভাই

বিআইটি রাজশাহী (বর্তমানে রুয়েট) থেকে ১৯৯৯ সালে জানুয়ারিতে আমরা পাস করে বের হই। আমাদের অন্য বন্ধুরা ১৯৯৮-এর ডিসেম্বরেই বের হয়ে যায়। লোটাস ও আমার সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা থাকায় এই বিলম্ব। ডিসেম্বরে পাস করা লেলিনকে আগেই বলা ছিল ও ঢাকা গিয়ে চাকরি পাওয়ার একটা আগাম পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সেই সূত্র ধরেই ১৯৮২-১৯৮৩ সেশনের ফিরোজভাই-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ইলেকট্রকাল ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজভাই তখন ফিলিপস-এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে মগবাজারে নিজেই অফিস দিয়ে ব্যবসা জাকিয়ে বসেছেন।

আমরা সারা দিন বিভিন্ন বেসরকারি অফিসে চাকরির ধরনা দিয়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদ ঠেলে ফিরোজভাইয়ের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসের দিকে এগোই।

ফিরোজভাই একে একে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করে গরম জিলাপি আনতে পিয়ন পাঠান। তারপর শুরু করেন নিজের জীবনের উথান আর সাফল্যের বীরগাথা।

মাঝে জিলাপি নিয়ে পিয়নের আগমন ঘটে। ফিরোজভাই শুরু করেন, জানো লোটাস, তোমাদের ভাবীর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয় তখন সে মাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থী। আমার চেয়ে পনেরো বছরের ছোট মেয়েটাই আমার জীবনটা পাল্টে দিল। আমার আয় উন্নতি সে তো তোমার ভাবীর জন্যই।

এই পর্যন্ত বলে ফিরোজভাই পরিতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলে চুপ মেরে যেতেন।

আমরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি, তারপর?

এরই মাঝে রিসিভার তুলে তিনি বিভিন্নজনের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার ব্যবসার কথা তোলেন।

আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তরুণ এই কোটিপতির দিকে তাকিয়ে থাকি।

এভাবেই দিন চলতে থাকে। অথচ আমরা চাকরি পাই না। ফিরোজভাইও তার ফার্মে আমাদের চাকরি দেয়ার কথা মুখেও তোলেন না। কিন্তু প্রায়ই তিনি কোটি টাকার বিল পাওয়ার কথা বলেন।

একদিন লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ফিরোজভাইকে বলেই বসলাম, আপনার এতো বড় ফার্ম। আমাদের দুই তিনজনকে আপনি চাকরি দিলেই তো পারেন। আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে পারবো আর আমাদের বেকারত্বের একটা গতিও হবে।

তোমাদের মতো ভালো ছেলেদের আরো বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেবো। তোমরা আমার এখানে কেন কাজ করবে? তোমাদের আমার ফার্মে চাকরি দিতে খুব খারাপ লাগবে ভাইয়া। একটু অপেক্ষা করো। ফিরোজভাইয়ের আস্থাসূচক উত্তর সঙ্গে সঙ্গে।

কোনো কোনোদিন ওঠে রাজনীতির কথা। বিএনপি করার পরেও ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিএনপির শাসন আমলে ব্যবসা ভালো পাননি সেই আফসোস। আওয়ামী শাসনেই তিনি ব্যবসা ভালো করেছেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারে নিজেদের আত্মীয়কে বিয়ে দেয়ায় আত্মীয় হওয়ার পরেও প্রধানমন্ত্রী কোনো ফেভার তাকে না করে বঞ্চিত করেছেন ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত।

তার সেই মর্মপীড়া আমাদেরও ছুয়ে যায় মাঝে মধ্যে। ছুয়ে যেতে হয়। কারণ ফিরোজভাই চাকরি নামের সোনার হরিণটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন।

মাঝে মধ্যে নয়া পল্টনে ভাসানী স্মৃতি সংসদে যাওয়ার পথে আমাদের তার গাড়িতে তুলে নিতেন। চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো? ক্যাসেট প্লেয়ারে গানটা শুনতে শুনতে ঢাকার অফিস ফেরতা লোকদের জ্যামে আটকা পড়ি।

এমন সময় ফিরোজভাই বলে বসেন, লেলিন, নীলফামারী থেকে ২০০১ সালে কাকে নমিনেশন দিতে হবে আমাকে বলো। তারেককে বললে সে আমার কথা ফেলবে না। আর লোটাস, তোমার এলাকা যেন কুষ্টিয়ার কতো নাম্বার আসন? ওখানে কার কথা বলবো?

আমরা প্রতাপশালী একজনকে পাশে পেয়ে খুবই বিগলিত হই।

একে একে মাস পার হতে থাকে। চাকরি কারোরই হয় না। সেই সময়েই বাড়িতে থাকা লোটাসকে একটা চিঠি লিখি যা আর পোস্ট করা হয়নি। ফিরোজভাইয়ের অফিসেও আমরা যাওয়া ছাড়ি না। মাগরিবের ওয়াক্ত হলে ওজু করে ফিরোজভাইয়ের ইমামতিতে নামাজ পড়তে হয়। সৎ রুজি-রোজগারের জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে নামাজ শেষ হয়। তারপরেই ফিরোজভাই বিভিন্ন অফিসের কর্তাদের ফোন করেন বিল ছাড়ানোর জন্য ঘুসের অংক নিয়ে দর কষাকষি করেন। এভাবেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়। আমাদের আরেকটা ব্যর্থ দিনের সমাপ্তি ঘটে।

একদিন ফিরোজভাই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা লিপিকে চিনতে।

লিপিআপা আমাদের সিনিয়র ছিলেন। এই লিপিআপাকে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এক ছেলে আমাদের বিআইটির ভেতর চড় মেরেছিল বলে লোটাস সেই ছেলেটিকে বাশ দিয়ে মেরেছিল।

আমরা লিপিআপাকে, বিশেষ একটা কারণে পছন্দও করতাম। সেই লিপিআপার কথা ফিরোজভাই জিজ্ঞাসা করাতে আমরা বিস্মিত হলাম।

আমাদের বিস্ময় দেখে ফিরোজভাই মুচকি হেসে বললেন, লিপি যখন হাফপ্যান্ট পরে তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। ও আমার প্রতি দুর্বলও ছিল। তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না ফিলিপস-এ যখন চাকরি করতাম তখন মিনি স্কার্ট পড়া কতো সুন্দরীরা আমার পেছনে ঘুরঘুর করতো। অথচ তারা আমার চরিত্রকে টলাতে পারেনি। কতো সুযোগ যে আমি পেয়েছিলাম, তোমরা বিশ্বাসই করতে পারবে না।

তখন আমার দুই ধারে বসা। লেলিন, লোটাস আর রুহুলের পায়ে পা দিয়ে চিমটি কাটছি। চিমটির ভাষা সবার মাঝে সঞ্চারিত হয় আফসোসের সমুদ্র হয়ে।

একদিন ফিরোজভাইকে কাদো কাদো হয়ে বলেই বসলাম, ফিরোজভাই, ঢাকাতে আমার একটা চাকরির ভীষণ দরকার। লেলিনকে দিয়েও বলালাম যেন ফিরোজভাইয়ের ফার্মেই একটা চাকরি দেন। কিন্তু বরফ গললো না। বেকারই থেকে গেলাম। অবশেষে ঢাকার বাইরে একটা চাকরি জুটলো। ঢাকার ওপর অভিমান করে বন্ধুদের ছেড়ে পাড়ি জমালাম জামালপুরের উদ্দেশ্যে।

লেলিনের একটা গুণ আমার খুব অপছন্দ। ও খুব সহজেই মানুষের দুর্ব্যবহার বা বেঈমানি ভুলে যায়।

জামালপুরে যখন ছিলাম সেই সময় বিআইটি রাজশাহীর প্রথম সমাবর্তনে গিয়েছিলাম। দেখি লেলিন ফিরোজভাইয়ের সঙ্গে খুব আদিখ্যেতা করে গল্প করছে। লেলিনকে ডাকতে কাছে গেলাম। তখন ফিরোজভাই একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো ভাইয়া? কোথায় আছো?

আমার সঙ্গে লোটাসও ছিল।

লজ্জা করলো না আপনার কথাগুলো জিজ্ঞাসা করতে? সদ্য পাস করে বের হওয়া কয়েকজন ছেলেকে আপনি যেভাবে ঘুরিয়েছিলেন চাকরি দেয়ার মোহ দেখিয়ে, তারপরেও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন কোন মুখ

নিয়ে? গায়ের ঝাল মিটিয়ে ফিরোজভাইকে যাচ্ছেতাই কথাগুলো বললাম। উচিত কথাগুলো বলেছিলাম বলে লোটাস, রুহুল, লেলিন ভীষণ খুশি হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শুনেছিলাম ফিরোজভাইয়ের ফার্মের কাগজপত্র নিয়ে লেলিন একটা টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করে মাত্র আশি হাজার টাকার কাজ করেছিল। সেই বিল থেকে ফিরোজভাই একটা কমিশনও লেলিনের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। আর ফিরোজভাইয়ের কাছ থেকে বেকার লোটাস দুই হাজার টাকা নিয়েছিল। সেই টাকা ফিরোজভাই পাচ বছর পর ফেরত চেয়ে লোটাসের কাছে অন্তত পচিশবার ফোন করেছিল।

এখন একটা চাকরি করি। তবে ঢাকার বাইরে। ঢাকার যন্ত্রণাময় যান্ত্রিক ও ট্রাফিক জ্যামে আবদ্ধ জীবন আমার ভালো লাগে না বলেই ঢাকার জীবন আমাকে কাছে টানে না। তারপরেও অফিসের কাজে যখন ঢাকায় যাই তখন একবারের জন্য হলেও প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। প্রায় পাচ বছর বাদে ফিরোজভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করি ওদের।

ওরা হেসে বলে, ফিরোজের ব্যবসা এখন লাটে উঠেছে। ওর নিঃস্ব হতে আর বাকি নেই।

লোক দেখানো দাম্ভিকতা ও অহংকার যে ভালো নয় তার প্রমাণ পেলাম। আশা করি সদ্য পাস করে বের হওয়া ছোট ভাইরা আমাদের মতো এমন প্রহসনে পড়বে না আমার এই লেখাটি পড়ার পর।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে
অনিচ্ছুক

পরস্ত্রী

– এস. হোসাইন

একশ–তে স্পিড মিটারে কাটাটা স্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ। সব জানালা বন্ধ। সবে কেনা নতুন গাড়ি শব্দহীন। চমৎকার মসৃণ রাস্তা। কাপুনি নেই, হাজার গাড়ির সঙ্গে আমরা চলছি ফৃ–ওয়ে দিয়ে। আশপাশে পরিচ্ছন্ন দৃশ্য।

মেলবোর্ন পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্সের প্লেনটি বোধহয় মিস করতে যাচ্ছি। ড্রাইভারের সিটে আমার স্ত্রী। পেছনে আমাদের দুই সন্তান।

সত্তর শতকে কোনো একদিন কৈশোরের খেলার ছলে আমার স্ত্রীকে তার দশ বারো বছর বয়সে কথা দিয়েছিলাম, একদিন নতুন লাল টুকটুকে গাড়ি কিনে দেবো। প্রায় তিন যুগ পরে এই তো সেদিন পুরনো দুটি গাড়ির পরে তৃতীয় গাড়িটি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লাল রঙের কিনতে গিয়ে কিনলাম কালো রঙয়ের, দুই সন্তানের দাবির মুখে।

গাড়ি থেমে যাওয়ার কারণে বুঝলাম আমরা এখন মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে। ট্রলিতে সুটকেস চাপিয়ে স্ত্রী ও ছেলেদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বোর্ডিং কার্ডের জন্য লাইনে দাড়িয়ে আছি। আমরা বাকি মাত্র কয়েকজন।

এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ঢাকা যাচ্ছেন?

লক্ষ্য করলাম, সঙ্গে তার বিবাহিত স্ত্রী। চমৎকার কাজ করা সালোয়ার কামিজ পরা।

তিনি বললেন, আমার স্ত্রী একা। ওনাকে ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন।

কিছু না ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে কাউন্টারে গেলাম। টিকেট, পাসপোর্ট দেখিয়ে বোর্ডিং নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হয়ে যখন প্লেনের গেটে আসি তখন আমরাই বোধহয় শেষ যাত্রী।

প্লেনে ঢোকার মুহূর্তেই বিনয়ের সঙ্গে হাসি দিয়ে যখন এয়ারহস্টেস দুজনকে স্বামী–স্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ জানালো তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেল। ঘামতে থাকি প্লেনের এয়ারকন্ডিশন্ড ক্যাবিনে। তাকাতে পারছিলাম না তার দিকে।

পাশাপাশি সিটে বসলাম। আমার ঘটনাবহুল জীবনে লজ্জা মাখানো অথচ মধুর পরিস্থিতি আর হয়নি এমন। এক রাত দুই দিন কিভাবে কাটাবো পরস্ত্রীর সঙ্গে? এটা প্রায় অসম্ভব। প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা, আমরা যে স্বামী–স্ত্রী নই! এসব ভাবতে ভাবতে বিশাল প্লেন চলতে শুরু করলো।

রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওড়ার মুহূর্তে তার সঙ্গে আমার প্রথম স্পর্শ। তার শরীর থেকে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ আমার চিন্তার জগতে অনেকখানি অংশে জড়িয়ে গেল। সুন্দরী এয়ারহস্টেসের হাসি, কখনো সিটবেল্ট বাধা, পত্রিকা, কম্বল, খাবার, লিকিওর ইত্যাদি নিয়ে সারাটা পথে দুজনকেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হলো বার বার।

কতো দিন কতো রাত অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে নাইট ক্লাব, সি–বিচ এবং হোটেলে কাটিয়েছি কখনো প্রিয় স্ত্রীকে নিয়ে, কখনো বা একা। উলঙ্গ–অর্ধউলঙ্গ, কাচা ফুলের মালা পরা, নাচের ছন্দের সঙ্গে মেলানো শরীর, আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি স্ত্রীর বিশ্বাস থেকে। ভাবি আমার স্ত্রীর কথা। আমার উদার মনের স্ত্রী সব সময় বলতেন You can look but don't touch, ইউ ক্যান লুক বাট ডোন্ট টাচ। তুমি দেখতে পারো। কিন্তু ছোবে না।

আমি যেন এক মহাযুদ্ধে জড়িয়ে গেছি আজ। মেঘের অনেক উপরে চলার পথে ওয়াইন নিলাম। তার জন্য কমলার রসের অর্ডার দিয়ে নিজের জন্য ফ্রেঞ্চ রেড ওয়াইন নিই। তিনি কি মনে করবেন তা নিয়ে ভাবি না। ছোট–খাটো কথায় জানতে পারি ঢাকায় থাকেন, মাস খানেক হলো বিয়ে হয়েছে, ভিসার শর্ত অনুযায়ী সাত দিনের জন্য অস্ট্রেলিয়া এসেছিলেন স্বামীর সঙ্গে। একা ফিরছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পাশাপাশি হেটেছি, বসেছি, কথা বলেছি, তবুও ভালো করে মুখটা দেখা হয়নি তখনো। প্লেন তখন প্রায় চল্লিশ হাজার ফিট উপরে। মেঘের ছায়া পড়েছে নিচে সমুদ্রের নীল পানির ওপর। সেই সঙ্গে আমার মনের ওপর তার ছায়া।

চিন্তাহীন তিনি খুবই স্বাভাবিক বুঝলাম তখনই, যখন জীবনের প্রথম এলকোহল স্বাদের জন্য অনুরোধ জানালেন। আমার দুশ্চিন্তা বাড়লেও এলকোহলের কারণে আমার অনুভূতির তীব্রতা কম। গ্লাসে ঠোটের ছোয়া দিতে দিতে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে কখন যে কুয়ালা লামপুর এসে গেছি তা বুঝতেও পারিনি।

লেফট লাগেজে (Left Luggage বা এয়ারপোর্টে সাময়িকভাবে সুটকেস ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার স্থান) ব্যাগ ও সুটকেস রেখে ট্যাকসি ধরলাম এয়ারলাইনের দেয়া ফাইভ স্টার হোটেলের উদ্দেশ্যে। দুই টিকিটে দুটো রুম বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও হোটেল রিসেপশন থেকে আমাদের অনুরোধ (ব্যবসায়িক স্বার্থে) করা হলো একই রুমে থাকার জন্য।

তাকাই তার দিকে। তিনি স্বাভাবিক।

কথা না বাড়িয়ে চাবি নিয়ে লিফটের দিকে এগোলাম রাত কাটানোর জন্য।

চমৎকার সাজানো রুম, কুইন সাইজ বেড, ছোট্ট বার ও ঝকঝকে বাথরুম। ভারী পর্দা সরাতেই সন্ধ্যার আলোতে দেখা গেল শহরের একটা অংশ। ক্ষিধে নেই তেমন। শাওয়ারে যাওয়ার ইচ্ছা আমার। তিনি বসে আছেন সোফায়। তার অনুমতি নিয়ে আমি বাথরুমে। পুরো বাথটাবে পানি ছেড়ে ডুবে আছি মুখ তুলে। শরীরের প্রচণ্ড একটা ভালো লাগা, অস্থির মনটাকে বাধার চেষ্টায় বুদ হয়ে থাকি। আমার স্ত্রী, সন্তান, ভালোবাসার মানুষগুলোকে মনের মাঝে এনে নাড়াচাড়া করে ভুলে থাকতে চাই পরস্ত্রীকে।

হঠাৎ দরজা খোলার ছোট্ট একটা শব্দ আমার চিন্তার অবসান ঘটায়। তিনি অনুমতি চান ভেতরে আসার।

আমার নগ্ন দেহটাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে পাশ ফিরি দেয়ালের দিকে। অনুভব করলাম তার উপস্থিতি। শ্রুতিমধুর শব্দের পর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কমোডের ফ্লাশের শব্দে পাগল হয়ে যাই। ধর্মহীন বিধাতাকে ডাকি। ঠাণ্ডা পানির কল ছেড়ে শরীর আর মনের তাপ শূন্যতে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করি।

কতোক্ষণ জানি না সময় গেল। হঠাৎ দরজায় তার কণ্ঠ, তাড়াতাড়ি শেষ করুন, কফি খাবো।

কিছুক্ষণ পর আমার রাতের পোশাক মিষ্টি হলুদ শর্টস আর ভি কলারের শাদা বর্ডারের নীল টি-শার্ট পরে যখন বের হলাম, শরীরটা ভালো লাগছিল। মাথা নিচু করে বললাম, মুখ হাত ধুয়ে আসুন।

এর মাঝেই রুম সার্ভিস কফি ও হালকা খাবার রেখে গেছে। চুপচাপভাবে সময় নিয়ে দুজনে কফি শেষ করলাম। টিভি অন করে পত্রিকা হাতে নিয়ে বললাম, ঘুম এলে বলবেন।

ঘুম আসছে। কিন্তু ঘুমের কাপড় নেই। উত্তরে তিনি জানালেন।

কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার প্রশ্ন।

দিন আপনার ব্যাগটা, দেখি কি পাওয়া যায়।

উজ্জ্বল শাদা রঙের এক পায়ে নীল বর্ডার দেয়া আমার স্ত্রীর কেনা নাইকি-র শর্টসটা হাতে নিয়ে আমার মুখের সামনে তিনি তুলে ধরলেন।

আমি বাকরুদ্ধ।

বাথরুম থেকে বের হলেন যখন, আমি অভিভূত। হৃৎপিণ্ডের মাঝে ঢোলের বড় বড় আওয়াজ। বাঙালি বৌ। তার সাহস, শক্তি ও সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করে। সুন্দর শরীরের বাকে শাদা নাইকি-র শর্টস আর টকটকে লাল ব্রা-য় শেষ বিকেলের গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া সূর্যের আলোর ছটা ভেসে ওঠে আমার চোখে। তলিয়ে যেতে থাকি রঙের মাঝে। চোখ বন্ধ করি।

হাতে আমার ঠাণ্ডা অস্ট্রেলিয়ান ফস্টার বিয়ারের ক্যান। দীর্ঘ চুমুক আমার তাপ কমাতে পারে না।

পা ঝুলিয়ে বেডে বসে আমার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন।

কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ দ্বিগুণ হওয়াতে শরীরের কিছু অঙ্গে চাপ অনুভব করতে থাকি। সুযোগ নেয়ার অভিযোগ করেনি কেউ কোনোদিন। আজকেও হারতে চাই না। শরীরকে মনের খাচায় রাখার জন্য মিনিবার থেকে ব্র্যান্ডি গলায় ঢালি।

শুয়ে পড়ুন। বলে বালিশ নিয়ে সোফায় বসি।

চোখে তার প্রশ্ন, আমি কেমন মানুষ?

প্রমাণ দিতে চাইনি আমি যে পুরুষ। সোফায় শোয়া নিয়ে ঝগড়া না বাড়িয়ে বাধ্য হয়ে শুতে হলো কুইন বেডের এক কর্নারে।

সকাল হতে আরো প্রায় সাত ঘণ্টা বাকি। তার শরীরের গন্ধ, নিঃশ্বাসের শব্দে ঘামতে থাকি ঠাণ্ডা ঘরে। রুমে আরো ঠাণ্ডা বাড়াতে গেলে আপত্তি তুলে বললেন, আমি খালি গায়ে।

ঘুমাইনি সে রাতে।

ওই রাত আমার জীবনের ব্যর্থতার রাত।

উঠুন, আমার গোসল শেষ, বাথরুম খালি। আটটায় কুয়ালা লামপুর-ব্যাংকক ফ্লাইট ধরতে হবে।

পরাজিত সৈনিকের মতো বাথরুমে ঢুকে শত চেষ্টাতেও রাতের ব্যর্থতা ধুতে পারলাম না। বাথরুম থেকে বেরুতেই আমার কপালে গভীর চুমু একে বললেন, আপনাকে মনে থাকবে, ক্ষমা করবেন।

আমি তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

আমি যে হেরে গেলাম ...।

মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে

shossain005@yahoo.com

পাতায়ার প্রেমে

ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামার পর পূর্ব নির্ধারিত মাইক্রোবাস আমাদের নিয়ে চললো সাই সাই করে। আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে, দুই ছেলের আনন্দের সীমা নেই। ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার পার হয়ে যাচ্ছি, তবুও যেন শেষ হতে চায় না।

প্রায় দুই ঘণ্টা চলার পর পাতায়ার *ডায়ানা গার্ডেন রিসোর্ট*-এর যখন উঠলাম তখন মনটা অন্য রকম আনন্দে ভরে গেল। বিশাল এলাকা জুড়ে *ডায়ানা গার্ডেন*। লজ, কটেজ, ড্রাইভিং রেঞ্জ, সুইমিং পুল, গলফ মাঠ, মনোরম পার্ক। এক কথায় অসাধারণ পরিবেশ।

ক্লান্ত দেহে রাতের ঘুম শেষে সকালে যখন উঠলাম তখন আমার মনে নানান প্রশ্নের জোয়ার। যে উদ্দেশ্যে পাতায়া এলাম তা সফল হবে তো?

সতেরো বছরের সমস্যা নিয়ে ধুকে ধুকে ক্ষয়ে যাচ্ছি। মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে কোনো শান্তি নেই। বাংলাদেশের হেকিমি, কবিরাজি নানান রকম বনজ চিকিৎসায় যখন কাজ হলো না তখন দেখা করলাম ঢাকার একজন নামকরা প্রফেসরের সঙ্গে। তিনি ওষুধ দিলেন। প্রতি মাসে ফলো আপ করলেন। কাড়ি কাড়ি টাকা নিলেন। অথচ কাজের কাজ কিছুই হলো না।

তারপর কিছু বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে গেলাম মাদ্রাজ। সেখানে পনেরো বিশ রকম টেস্ট শেষে ডাক্তার বললেন, আমার শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, পুরোটা মানসিক সমস্যা।

আবার মন ভেঙে গেল।

আসার পথে গেলাম কলকাতা। ওখানকার ডাক্তার সব দেখে বললেন, বয়স চল্লিশ পার হওয়ার পর এ রকম সমস্যা হয়। এটা নাকি জেনারেল ডিজেনারেশন প্রক্রিয়া। তিনি আমাকে ভায়াগ্রা টাইপ একটা ওষুধ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

মাস খানেক ওই ওষুধের কার্যকারিতা ছিল। তারপর *যেই লাউ সেই কদু* অবস্থা হয়ে গেল।

এর মাঝে একদিন থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য সেবার ওপর মুন্নী সাহার বিশেষ রিপোর্ট দেখলাম এটিএন বাংলায়। সেখানে জানতে পারলাম ব্যাংকক, *পাতায়া হসপিটাল* সম্পর্কে। তারপর ইন্টারনেটে দেখলাম এ হসপিটালের ওয়েবসাইট। বিশ্বের বারোটি ভাষায় তাদের ওয়েব সংস্করণ চালু আছে। আমাদের বাংলা ভাষাও আছে। বিস্তারিত পড়ে খুবই অবাক হলাম। আগ্রহ থাকলে কি-ই না করা যায়! অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাংকক পাতায়া হসপিটালে যাবো।

ডায়ানা গার্ডেনের কথা বলছিলাম। সকালের নরম রোদের উজ্জ্বল আলোয় সব নতুন দেখাচ্ছিল। সকাল দশটায় গেলাম ব্যাংকক পাতায়া হসপিটালে। ঝকঝকে, চকচকে পরিবেশে *সাবাদিখা* (স্বাগতম) বলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়েরা অভ্যর্থনা জানালো। তারপর গেলাম নামকরা ইউরোলজিস্ট ডা. জিমি-র চেম্বারে। *ফেরেশতার মতো মানুষ* কথাটি জীবনে অনেক শুনেছি। কিন্তু দেখিনি কখনো। ডা. জিমির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হলো এই প্রথম ফেরেশতার মতো মানুষ দেখছি। অসাধারণ ও অমায়িক ব্যবহারের মানুষ তিনি। বাংলাদেশ-ইনডিয়ার এতো ডাক্তার দেখালাম কারো সঙ্গেই ফ্রি হয়ে কথা বলতে পারিনি। এদিকে প্রথম দিন ডা. জিমির চেম্বারে কথা বললাম প্রায় চল্লিশ মিনিট। সব মনোযোগ দিয়ে শুনে তিনি আমাকে জানালেন অন্তত এক সপ্তাহ পাতায়াতে থাকতে হবে। তারপর ফলো আপ। ইউরিন ও ব্লাড টেস্ট করে ডা. জিমি তিন রকম মেডিসিন দিলেন। শেষে বললেন, ডোন্ট ওয়ারি ম্যান, এনজয় দি ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট রিসোর্ট সিটি!

প্রথম দিনই মানসিকভাবে অনেক রিলাক্সড হয়ে গেলাম।

পরদিন থেকে শুরু হলো আমার মেডিসিন নেয়া ও সপরিবারে পাতায়া ভ্রমণ।

ডায়ানা গার্ডেন-এ সে সময় আরো তিনটি বাঙালি ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা হলো, ওনারা সবাই মেডিকাল ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছেন। আমরা প্রথমে গেলাম পাতায়া বিচে। যে রকম নাম শুনেছিলাম সে রকম নয় মোটেও। স্রোত তেমন নেই, শান্ত সৈকত।

সেখানে দেখা হলো বিজরী বরকত উল্লাহ, মীর সাব্বির, লিটু আনাম, শ্রাবন্তীসহ আরো অনেক বাংলাদেশি টিভি স্টারের সঙ্গে। তারা সেখানে *সোনালী স্বপ্ন* নাটকের শুটিং করছিলেন। আমার ছেলে জেট স্কি-তে চড়লো। চমৎকার সময় পার হলো।

পরদিন গেলাম জমটিয়ান বিচে। পাতায়া বিচ থেকে পনেরো মিনিটের পথ। সেখানে গিয়ে দেখি এক নয়নাভিরাম পরিবেশ। উত্তাল ঢেউ, দূরে পাহাড়, নীল আকাশ, সাগরের নীল জল। অনেক ছবি তুললাম। ছেলেমেয়েরা সাগরে লাফালাফি করলো। বড় চিংড়ি ফ্রাই খেলাম খুব শস্তায়। প্রবল বাতাসে প্যারাট্রুপিং করলাম আমার ছেলেসহ। সে এক দুঃসাহসী অভিযান যা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

ছয়জনের গ্রুপ হওয়ায় পাতায়া হসপিটালে কিছু টুর প্যাকেজে বিশেষ ডিসকাউন্টে আমরা ঘুরে এলাম আলকাজার শো, নংনোচ গার্ডেন, কোরাল আইল্যান্ড, আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ড, ক্রোকোডাইল ফার্ম, কো-সামেট আইল্যান্ড। সব দেখার মতো জায়গা। একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনা হয় না। এতো সব সৌন্দর্যের মাঝেও আছে ওয়াইন-উইমেনের পসরা, ওয়াকিং স্ট্রিট-এর মতো সেনসেটিভ বিনোদন স্পট যেখানে বৌ, বাচ্চা নিয়ে না যাওয়াই ভালো। তবে কাটার ভয়ে গোলাপকে তুচ্ছ করি না, পৃথিবীর সুন্দরগুলো আলাদাভাবে খুজে নিতে প্রত্যাশী।

এবার আসি খাবার-দাবারে। বিদেশে গিয়ে দেশি খাবারে হোমসিক হওয়ার মানুষ আমি নই। অসাধারণ সব সি ফুড, থাই সুপ খেয়ে আমার রোগের চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে গেল। তবে থাই লোকজন বেশি ঝোল খায়। ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করে দেশি খাবারও খেয়েছি কয়েক বেলা। পাতায়া-তে বেশ কিছু বাংলাদেশি ও ইনডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। ম্যাকডোনাল্ডস ও কেএফসি-তেও গিয়েছিলাম। তবে কোরিয়ান *এমকে* রেস্টুরেন্টের *ডাক* (Duck) রোস্টের স্বাদ ভুলতে পারবো না। আহ! এখনো জিভে লেগে আছে যেন।

থাইল্যান্ডে গিয়ে শপিং হবে না তা কি করে হয়! আমার দুই মেয়ে ও তাদের মা চষে বেড়িয়েছে লোটাস, বিগ-সি, মাইক, ক্যারিফোর-এর মতো শপিং মলগুলো। জামা-কাপড় আর কসমেটিকসের জন্য থাইল্যান্ডের তুলনা নেই। দামেও অনেক সাশ্রয়ী।

নির্দিষ্ট তারিখে আবার গেলাম ডা. জিমির চেম্বারে। গত সাত দিনে আমার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মেডিসিনের ফলাফলের বিস্তারিত লিখে কাউকে বিব্রত করতে চাচ্ছি না। অশেষ ধন্যবাদ ড. জিমি-কে। সতেরো বছরের নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।

ছয় মাসের মেডিসিন নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। ব্যাংকক পাতায়া হসপিটালের বাংলাদেশি মার্কেটিং ম্যানেজার রকিব ও শিমুলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এ দুই ডায়নামিক তরুণ আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। থ্যাংকস টু অল। পাতায়া থেকে সরাসরি ব্যাংককে এসেছিলাম। কিন্তু যানজট ও কোলাহলের কারণে একদিনের বেশি থাকিনি।

পুনশ্চ : পাতায়া ছাড়ার আগের রাত। সময় সাড়ে বারোটা। ডায়ানা গার্ডেনের পার্কে আমি ও আমার স্ত্রী পাশাপাশি বসে গল্প করছি। নিঝুম জ্যোৎস্না রাত। চারদিক নীরব। আমার ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে। ওই আলো-আধারের রহস্যময় পরিবেশে হঠাৎ এক অদ্ভুত রোমান্টিসিজম জেগে ওঠে আমাদের মাঝে। অবোধ বালক-বালিকার মতো আমরা ছেলেখেলায় মেতে উঠি। আমাদের মনের অগোচরে সময়গুলো খুব দ্রুত কেটে যায়। ... তারপর কি হয় তা আর জানি না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখি নীলাভ সুইমিং পুলে ভাসছি আমরা দুজন। আকাশে হাসছে অনন্ত ভালোবাসার মায়াবী চাদ।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

iamollah@yahoo.com

ভাষা সৈনিক বিভ্রাট

– মোহাম্মদ নওসাদ আলী

গত বছর রাজশাহীর বেশ কয়েকটি সাহিত্য সংগঠন *ভাষা সৈনিক* আখ্যায়িত করে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধিত করেছে। আকস্মিকভাবে এতো ভাষা সৈনিক রাজশাহীতে এসে জুটলেন কিভাবে আর এতো দিন তারা কোথায় তাদের দীপ্তি লুকিয়েছিলেন, সেটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়াবে বৈ কি!

রাজশাহীতে ভাষা সৈনিকের আবির্ভাব সম্পর্কে সেদিন *লোকপত্র* দফতরে আড্ডা জমে উঠেছিল। অনেকে বললো, তারা সবাই ভুয়া ভাষা সৈনিক। আলোচনাটি একেবারে অনুমান নির্ভর নিন্দা–চর্চায় পর্যবসিত হচ্ছে দেখে আমাদের মধ্যে প্রবীণ, স্বল্পবাক ও প্রাজ্ঞ লেখক জাহাঙ্গীর আলীভাইকে এ বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলাম।

তিনি বললেন, ১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহীতে অধিক বেগবান ছিল। যশস্বী বাম নেতা প্রয়াত আতাউর রহমান, প্রয়াত প্রফেসর একরামুল হক, প্রয়াত ডাক্তার এএসএম গাফফারদের নেতৃত্বে রাজশাহীতে *রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই* এই দাবি মূলত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতে একটা মেসেজ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি আরো বলেন, আজকাল হয়তো কেউ স্বীকারই করতে চাইবে না, রাজশাহী কলেজ চত্বরে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিন রাতে কয়েকশ ইট জোগাড় করে রাতারাতি যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল তা ছিল দেশের সর্বপ্রথম শহীদ মিনার। অকস্মাৎ শহীদদের শোকে রাতারাতি শহীদ মিনার নির্মাণ করার কথা তখন ঢাকার কেউ ভাবেননি অথবা মিলিটারির তর্জন– গর্জনে হয়তো সে পরিস্থিতি রাতে ঢাকায় ছিল না।

বললাম, আমরা আশা করি আপনি জীবদ্দশায় এগুলো অবশ্যই লিখে যাবেন।

একজন ফোড়ন কেটে বললো, জীবদ্দশায় ছাড়া মৃত্যুর পরেও লেখা যায় তা জানতাম না তো!

এবার হাস্যরসিক নূরউল ইসলামভাই আমাকে বললেন, এসব গুরুগম্ভীর আলোচনা আজকের মতো এখানেই খতম হোক। এবার আপনি আমাদের কিছু রম্য কথা শোনান। মেজাজটা চাঙ্গা হোক।

রম্য কথা। বাপ রে! দারুণ চাপে ফেললেন দেখছি। এ মুহূর্তে তেমন কিছু মনে করতে না পারলেও একটা বাস্তব গল্প আপনাদের শোনাই।

১৯৮০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মহল্লার সংস্কৃতি সেবীরা মহা ধুমধাম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাহাবুবমামাকে *ভাষা সৈনিক* হিসেবে সংবর্ধনা দেয়। তিনি আমাদের সকলের কমন মামা ছিলেন। আমার মনে হলো মামা আমাদের ধোকা দিয়ে ভুয়া ভাষা সৈনিক সেজে এ সংবর্ধনা নেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। কেননা ১৯৮০–তে তার বয়স চল্লিশের মতো। সে অনুযায়ী ১৯৫২–তে তার বয়স ছিল বারো বছর। এ বয়সের একজন বালক কি করে ভাষা সৈনিক হতে পারে?

আজীবন কুমার (অবিবাহিত) এই মাহাবুবমামা যাত্রাদলের নায়িকার পার্ট করে বেড়িয়েছেন। ১৯৬০ সালের দিকে *রূপবান* যাত্রায় তিনি রূপবান কন্যা সাজতেন। তার নিপুণ অভিনয় ও রূপ মাধুর্যে পাগল হয়ে সেকালের তরুণরা নাকি বৌ তালাক দিয়ে মাহাবুব মামার জামার তলে লুকাতে চাইতো। যাত্রা প্যান্ডলের যে বাশে হাত রেখে মাহাবুবমামা রূপবান কন্যা সেজে রহিমের বিরহে কেদে সকল দর্শকের কাদিয়ে অভিনয় করেছিলেন সেই বাশটি তখনকার দিনে পাচশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। মাহাবুবমামা কিছুটা বাড়িয়ে বললেও ঘটনা শুধুই রটনা নয়। আত্মীয়স্বজনহীন মাহাবুব মামাকে নিজ বাড়িতে ঠাই দিয়ে শেষ জীবনে বাখরাবাজের শাহবাজ মোড়ল তিন পত্নীকে ছেড়েছিলেন।

মাহাবুবমামাকে সে যুগের তরুণরা *মেহবুবা* বলে সম্বোধন করতো। আমি নিজ চোখে দেখেছি মেয়ে সাজালে মাহাবুবমামাকে *মধুবালা*–র চেয়েও সুন্দরী মনে হতো। এই মধুবালাতুল্য মাহাবুবমামা আবার ভাষা সৈনিক কিভাবে সাজলেন তা আমার কাছে মস্ত ধাধা হয়ে আমায় যেন গাধায় পরিণত করে ফেললো। মাহাবুবমামা কারো প্রতি রাগ করেন না, কারো কোনো প্রার্থনায় না করেন না, কেউ কোনো অর্থ সাহায্য চাইলে পকেটের শেষ টাকাটিও দিয়ে দেন। এমন একজন পরোপকারী মানুষকে ভুয়া ভাবা কি ঠিক হবে? একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখি না, তিনি কি বলেন।

সাত দিনের মাথায় তেমাথার রাস্তায় মামার সঙ্গে দেখা হলো। বললাম, মামা কথা আছে।

এক ধামা আম নিয়ে রাতে বাসায় আসিস। শিস দেবো, খাবো আর কথা বলবো। এখন সময় নেই।

সময় নেই কেন? চাকরি পেয়েছো নাকি?

আরে না, চেয়ারম্যান সাহেব এলাকার একমাত্র ভাষা সৈনিক হিসেবে আমাকে পুরস্কৃত করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেই পুরস্কারের দুই হাজার টাকা আজ দেবেন। তাই আনতে কাউন্সিল অফিসে যাচ্ছি।

সেই বলো। তাহলে ভাষা সৈনিক খেতাবটা কাজে লাগছে, কি বলো?

আরে ভাগ্নে। কম ঠ্যালায় তো আর ভাষা সৈনিক হইনি!

সে কেমন?

রাতে আসিস। তুই লেখক মানুষ তো। তোকে সব খুলে বলবো। সব খুলে বলে না গেলে তো এ দেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস হা–হুতাশ করে মরবে।

মাহাবুবমামার কথা মতো সন্ধ্যার পর পরই উপস্থিত হলাম তার আস্তানায়। এক ধামা আম নিতে পারিনি বটে তবে মামার পছন্দসই গোটা চারেক পাকা ফজলি আম সঙ্গে নিয়েছিলাম। খোশ মেজাজ ছাড়া গল্প জমে না। তো মামা আবার অতিথি সমঝদার মানুষ। চারটি আমের দুটি মামা খেলেন আর বাকি দুটি তার পীড়াপীড়িতে আমাকে খেতে হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, ১৯৫২–তে মামা তোমার বয়স বড় জোর বারো বছর। তুমি ভাষা সৈনিক হলে কি করে?

বলছি রে বলছি। সেই দুঃখের কথা বলবো বলেই তো তোকে ডেকেছি। আচ্ছা, বলতো একাত্তরে পাকিস্তানি হায়েনারা বাংলাদেশের কতো মেয়েকে বীরাঙ্গনা বানিয়েছে?

ত্রিশ হাজার।

সে তো কাগজে কলমে। প্রকৃত সংখ্যা তার অনেক বেশি হবে। অনেক মেয়েকেই তো তারা দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে গুলি করে মেরেছে।

আমি তো একাত্তরের কথা শুনতে চাইনি।

তোর একটা দোষ, তুই বেশি ছটফট করিস। এতো অধৈর্য হলে চলে? আরে একাত্তর এলো কোথেকে? বাঙালিরা শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শিখলো কোথেকে? তার ভিত্তি তো ১৯৫২। পাকিস্তানী সৈন্যরা যে কতো পাশবিক, কতো বড় কামুক, কতো বড় ধর্ষক তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী আমি।

কিভাবে?

১৯৫২–র বীরাঙ্গনা একমাত্র আমি।

বলো কি মামা? তুমি বেহুশের মতো কথা বলছো? তুমি না পুরুষ। তুমি আবার বীরাঙ্গনা হলে কি করে?

ভাগ্নে এখানেই তো কবি নীরব, সে বেদনার কথা, সে লজ্জার কথা, সে ত্যাগের কথা বলবো বলেই তো তোকে ডেকেছি। শোন তাহলে।

শাহবাজদাদুর মেজ ছেলে আব্বাসকাকু সে সময়ে ঢাকা মেডিকাল কলেজে পড়তেন। ঢাকা দেখার আমার খুব শখ। পাড়ার এতিম ছেলে হিসেবে সবার আদর আপ্যায়ন পেয়েছি যথেষ্ট। সে বছর জানুয়ারি মাসে কাকু

ছুটিতে এলে তার সঙ্গে ঢাকা যাবো বলে বায়না ধরলাম। কাকু আর দাদুকে এমনভাবে পায়ে ধরে পটালাম, তারা আর না করতে পারলেন না।

দাদু বললেন, নিয়ে যা এতিম ছোড়াটাকে। নিজের খরচে তো কোনোদিন ঢাকায় যেতে পারবে না। তোর সঙ্গে গিয়ে একবার ঢাকা দেখে আসুক। এতোই যখন শখ। তাছাড়া তোর বাক্স–প্যাটরাও এবার কম নয়। ওকে সঙ্গে নিলে তোর সুবিধাই হবে। ওর জন্য বাড়তি খরচ আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

আক্কাসকাকুর সঙ্গে ঢাকায় গেলাম। কয়েকদিন পরেই এলো উত্তাল ফেব্রুয়ারি। কাকুর সঙ্গে মেডিকাল কলেজ হস্টেলেই থাকতাম। ২১ তারিখের কারফিউ ভাঙার দীপ্ত শপথ নিয়েছে ছাত্ররা আর তার নেতৃত্বে রয়েছেন মেডিকাল কলেজ পড়ুয়া হবু ডাক্তাররা। এ সংবাদ গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সম্ভবত আগেই জানা ছিল। তাই ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী মেডিকাল কলেজ হস্টেল ঘেরাও করে ফেলে। আন্দোলনরত ছাত্ররা রাজপথে ছিল বলে পুলিশ ওদের পেল না।

আমি তো বারো বছরের বালক। কলেজ হস্টেলে ঘুমাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। হাজির করলো এক পাঞ্জাবি কমান্ডারের সামনে। কমান্ডার ভালো করে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। উর্দুতে কি বললো বুঝতে পারলাম না।

তারপরে আমায় পাঠিয়ে দেয়া হলো এক পুলিশ মেসে। ওই মেসে থাকতো সেই কমান্ডারসহ দুজন পাঞ্জাবী পুলিশ। রাতে ওরা পালাক্রমে আমাকে ব্যবহার করলো নারীর বিকল্প হিসেবে। পরের দিন শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের ব্যথায় বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলাম না। কিছু খাওয়ার রুচিও ছিল না।

ওদের বাঙালি বাবুর্চি এসে খাবার জন্যে ডাকাডাকি করলো।

কিন্তু খাবার সাধ কিংবা ওঠানোর সাধ্য কোনোটিই আমার ছিল না।

সন্ধ্যার পরে সেই বাঙালি বাবুর্চি আবার এলো।

এবার আর তার খাবার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। খাওয়ার পর সে আমাকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেল। শাড়ি ব্লাউজ পরিয়ে একেবারে নারীতে পরিণত করলো। তারপরের কথা বলার মতো না।

এভাবে দুটি মাস কেটে গেল। প্রতি রাতেই ও যাত্রাপালায় কৃত্রিম বধূর ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হতাম।

একদিন বাঙালি বাবুর্চির পায়ে ধরে বললাম, তুমি আমার স্বজাত বাঙালিভাই। এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো।

সে যেন কি ভাবলো এবং বললো, আমার মতো তোকেও আবার ধরে না আনে।

তার মানে তুমিও আমার মতো ওদের খেলার পুতুল!

তবে আর বলছি কি!

শেষ পর্যন্ত সে তার কথা রেখেছিল।

আমার যা হয় হবে, যা যা তুই পালিয়ে যা, পালিয়ে যা!

আমাকে ফিরে পেয়ে সারা মেডিকাল কলেজের ছাত্ররা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো। আমাকে শ্রেষ্ঠ ভাষা সৈনিক হিসেবে সংবর্ধনা দিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মনোভাবাপন্ন দৈনিকগুলোতে নিউজ হেডিং হলো।

এরপর মামা সে সময়ের জাতীয় দৈনিক কিছু পত্রপত্রিকার নিউজ হেডিং আমাকে দেখালেন।

বিমূঢ় বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। বললাম, দেশের জন্য, বাংলা ভাষার জন্য তোমার এতো বড় ত্যাগকে আমরা না জেনে সন্দেহের চোখে দেখে আসছি। মামা, আমাদের তুমি ক্ষমা করো।

তোরা আমাকে আরো প্রশ্ন করিস, আমি বিয়ে করে ঘর–সংসারী হইনি কেন? আমার যে ক্ষমতা ওই সব খচ্চর পাকসেনারা শেষ করে দিয়ে গেছে। আমি যে এখন ... কথা শেষ না হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন মাহাবুবমামা।

সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার মুখে জুটলো না।

আমার জানা এই বাস্তব ঘটনার কথা বলতে বলতে দেখি জাহাঙ্গীর আলী, ফজলুল হক, নুরুল ইসলামভাইদের চোখে পানি।

সমাপ্তি টেনে বললাম, আমার বিভ্রাট শুনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনারা হাসেন। শোকের মাস এ ফেব্রুয়ারিতে আজ না হয় একটু কাদুন।

রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী থেকে

কোকের বোতলে

– শাতেরা তাবাস্‌সুম মুনা

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে শুধু আমেরিকাতেই না, পৃথিবীর সব দেশেই মুসলমান বিদেশিদের একটু অন্য রকম চোখে দেখা হয়। এই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের লেখায় উঠে এসেছে।

এবার নিজেই এমন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম।

আমার ছেলেমেয়ে দুজনেরই ইচ্ছা টোকিও ডিজনিল্যান্ড দেখার। তাদের জন্যই এবার টোকিও যাওয়া। আতিকভাইরা এবং আমরা টোকিও ডোম ও অন্যান্য জায়গায় এক সঙ্গে গেলাম। বাচ্চারা ডিজনিল্যান্ড গিয়ে ভীষণ মজা করলো। বিভিন্ন রাইডে উঠলো।

প্রচণ্ড গরম, সারাক্ষণ হাতে কোল্ড ড্রিংকস। মুমু তার নিজের পিঠের ব্যাগে কোকের বোতল রেখেছে। একটু পর পর *আতসুই* (নোদোগা কাওয়াই তা অর্থ খুব গরম) আমি তৃষ্ণার্ত বলে কোক খাচ্ছে আবার ব্যাগে রেখে দিচ্ছে। একদিনে পুরো ডিজনিল্যান্ড ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। সকাল নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুরেও পুরো শেষ হলো না।

পরদিন হাতো বাসে করে টোকিওর অন্যান্য জায়গায় গেলাম। সম্রাটের বাড়ি, রেইনবো বৃজ, ফুজি টেলিভিশন, আসাকুসা ইত্যাদি জায়গা। আসাকুসা অনেকটা বাংলাদেশের গুলিস্তানের মতো। রাস্তার ধারে লোকজন ছোট দোকানে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে। দরদামও করা হয়। হাজার হাজার পর্যটকের ভিড়। সবাই সুভেনির কিছু না কিছু কিনছে, আমরাও কিনলাম।

সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রাত এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলাম।

অনেক দিন পর শম্পাভাবীদের সঙ্গে দেখা। সারা রাত আমি, ভাবী, পাপ্পু, আতিকভাই গল্প করে কাটালাম। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে এয়ারপোর্টে রওনা হলাম।

ইমিগ্রেশনের লাইনে দাড়িয়েছি, ভেতরে ঢোকার জন্য তামজিদ ও পাপ্পু সামনে, আমি ও মুমু পেছনে। মুমুর পিঠের ব্যাগে তার খেলনাসহ ছোটখাটো জিনিস ও চাকাওয়ালা ঠেলার হ্যান্ড লাগেজ। এ দুটোই লাগেজ।

ইমিগ্রেশন অফিসার স্ক্যানার থেকে লাগেজ নিয়ে বললো, একটু খুলে দেখতে হবে।

বললাম, তোমরা খোলো এবং গুছিয়ে বন্ধ করে দেবে।

লাগেজে তেমন কিছু নেই। বাচ্চাদের দুই একটা কাপড়, বিভিন্ন জায়গা থেকে কেনা সুভেনির ও মুমু, তামজিদের জন্য চকলেট।

তারপরও ছেড়ে দিল না। মাথায় কাপড় দেয়া এক মহিলার সব কিছু চেক করলো।

সবাই শুধু নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

মুমুকে ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞাসা করছে, টোকিওতে কোথায় কোথায় গিয়েছিল। কি কি করছিল।

এদিকে প্লেনের সময় হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেরি দেখে পাপ্পু এসেছে, আমরা কেন দেরি করছি। কেন যে আমাদের যেতে দিচ্ছে না কিছু বুঝতে পারছি না। ইমিগ্রেশন থেকে কিছু বলছেও না। শুধু অপেক্ষা করতে বলছে।

কিছুক্ষণ পর আবার মুমুর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ছয় বছরের মেয়ে মুমুকে তাদের প্রশ্ন করার কারণ কি।

রহস্যটা উদঘাটন হলো আরো কিছুক্ষণ পর। মুমুর পিঠের ব্যাগে একটা অর্ধেক খাওয়া কোকের বোতল রয়েছে। যা তাদের সন্দেহের কারণ। বোতলটি তারা কেউ ধরছে না, দূরে দাড়িয়ে আছে।

একজন আবার ছবি তুলছে, বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলছে।

এরই মধ্যে কথা বলতে বলতে মুমু বললো, মামণি *নোছো গা কাওয়াই* বলে তার সেই কোকের বোতল থেকে কিছুটা কোক খেয়ে ফেললো। অমনি যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এতোক্ষণ ধরে যে ইমিগ্রেশন অফিসাররা গম্ভীর মুখে সন্দেহের চোখে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা করছিল আর কোকের বোতলে করে লিকুইড বোম বহনকারী ভাবছিল তারা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো – *সুইমাছেন গোমেন নাছাই* বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ইমিগ্রেশন পার করে দিয়ে গেল।

জাপান থেকে

আট বছর পরে

– টুকু

আজ ২৯ জুন ২০০৫।

মা কে দেখবো বলে আট বছর পর বাংলাদেশে যাবো।

উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হৃদয়। মাকে দেখবো, আমার বাবাকে দেখবো।

যে মাকে কাদিয়ে এসেছি আট বছর আগে সেই মাকে দেখবো। হাসবো।

তারপর ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, অনেক অনেকজন।

আরো দেখবো আকাশ, বাতাস, মাটি আর মানুষ। যেখানে আমার শেকড় রয়েছে।

আজকের আমার এ পত্র পল্লব যে মাটির রসে ভর করে এতোদূর এসেছে।

সেই মাটিতে পা রাখবো আট বছর পর। আমার স্ত্রী, একুশ দিন আগেই পৌছেছে।

আমি যাবো আজ।

কনটিনেন্টাল এয়ারলাইনস। বুশ আন্তির্জাতিক এয়ারপোর্ট।

টিকেট আছে রিজারভেশন নেই। দিতে পারেনি এজেন্ট।

গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে যাত্রীতে ঠাসা এয়ারপোর্ট।

সিট পাওয়া অনিশ্চিত, ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছি উৎকণ্ঠায়। আজকে যাওয়া হবে তো?

অবশেষে ডাক এলো এবং সিট হলো। বন্ধুকে শুভ সংবাদ জানালাম।

রাত আটটা বাজলো।

চোখে এলো কয়েক ফোটা জল।

৩০ জুন ২০০৫।

সারা রাত মেঘের ওপর ভেসে ভোরবেলা ঘন মেঘের বুক চিরে নেমে গেলাম লন্ডন এয়ারপোর্টে।

বেশ কিছু সিলেটি ভাষার মানুষের দেখা পেলাম। পুরনের ছোয়া পেয়ে আনন্দে ভরে গেল মন।

চার ঘণ্টা বাদে এমিরেটস এয়ারলাইন্স আবার যাত্রা শুরু হলো।

ইওরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলো পার হয়ে যাচ্ছি।

আরবি আতিথেয়তা ও আনন্দে গানে কেটে গেল সাত ঘণ্টা।

বুকের ভেতর সীমাহীন আবেগ আর উচ্ছ্বাস। এসে গেছি অনেক কাছে।

আমার মায়ের কোলের সুবাস পাচ্ছি।

১ জুলাই ২০০৫।

রাত সাড়ে বারোটা।

ঝকঝকে আলোর নগরী দুবাইতে নামলাম।

ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছি। গন্তব্য সরাসরি আমার বাংলাদেশে।

কয়েকজন বাদে আমরা সকলেই এখন বাংলাদেশি, একজন মন্ত্রীও আছেন।

আমার মতো সব মানুষগুলো কতোকাল পর এক সঙ্গে হলাম।

প্রায় সকলের হাতে কমপক্ষে একটি করে শপিং ব্যাগ, অগোছালো, উপচে পরা জিনিস।

নিয়ম বহির্ভূত অধিকাংশ। আমার খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল ওই ব্যাগগুলোর জিনিস যেন সব সীমাহীন ভালোবাসা, আপনজন। জিনিস নয়।

স্বল্প আয়ের মানুষগুলো। কিন্তু ভালোবাসার কোনো কমতি নেই।

ভোর চারটা। তারপর সকলেই আমরা আকাশে উড়লাম।

করাচি আর দিল্লির আকাশে উড়ে, জয়পুর, আগ্রা, বিহার হয়ে, মানিকগঞ্জের ওপর এসে বিমানের গতি কমে গেল।

মেঘে আকাশ ঢাকা।

সবুজের দেখা পেলাম না। এ যেন অভিমান আর বিরহের বিষণ্নতা।

এখানেই আমার শেকড়, জন্মেছি এখানেই।

ধলেশ্বরী নদীর তীরে, একটি সবুজ গ্রামে।

বোধ হওয়ার পর আমার জীবনের প্রথম ভোর এখানেই দেখেছি।

ককপিট থেকে ভেসে এলো আনন্দ–বার্তা, আমরা ল্যানডিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তারপর ধীরে ধীরে মেঘগুলোকে সরিয়ে ঢাকা জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে মাটি স্পর্শ করলাম।

মায়ের কোলে ফিরে এলাম। আনন্দে কাদলাম।

বেলা বারোটা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুলাম।

অগণিত মানুষ, সেই পুরনো দিন, সেই পরনো কথা, সেই পুরনো সুর।

আমাকে নিতে এসেছে আমার স্ত্রী এবং আমাদের বড় সন্তান।

বুকে তুলে নিলাম।

সড়কে এসে মনে হলো যেন রাস্তাগুলো অনেক সুরু হয়ে গেছে, মানুষগুলো অনেক কালো হয়ে গেছে, দালানগুলো যেন মাথার উপরে বেকে আছে।

চিনতে পারছি না সকল অলি–গলি যা ছিল সেই সময়ের নিত্যবাস।

কিন্তু চিনতে অসুবিধা হয়নি আমার সেই আকাশ।

মায়ের কোলে শুয়ে যা দেখেছি সেই দিন। আরো ভুলিনি বাতাসের সেই সুবাস।

গাড়িতে বসেই আমার স্ত্রী পাসপোর্ট, ওয়ালেট ও দরকারি কাগজগুলো সরিয়ে ফেললো আমার কাছ থেকে।

যদি ছিনিয়ে নেয় কেউ!

ভেবেছে হয়তো আমি সব ভুলে গেছে, কেমন করে আগলে রাখতে হয় এসব, এ ঢাকা শহরে।

আলাউদ্দিন আর *রসের* মিষ্টি ঘর হয়ে ফিরে এলাম আমাদের সন্তানের ঘরে অনেক দিন পরে।

ছত্রিশ ঘণ্টা পর অবকাশ যাপন।

ফ্রম হিউস্টন টু ঢাকা।

৫ জুলাই ২০০৫

ঢাকা শহর।

একটানা তিন দিন বৃষ্টির পর আজ রোদ–মেঘলা আকাশ।

মানিকগঞ্জ যাবো আজ মাকে দেখতে।

ফার্মগেট, চন্দ্রিমা উদ্যান, মিরপুর সড়ক, গাবতলি, হেমায়েতপুর, সাভার, নয়ারহাট, কালামপুর, জাগির পর হয়ে মানিকগঞ্জের ছোয়া পেলাম।

মন ময়ূরী নাচিছে আমার। তাধিন–তাধিন তা–তা থই থই।

ভুলিনি কোনো রাস্তা।

বেলা এগারোটায় মানিকগঞ্জ পৌছালাম।

ছোট্ট একটি বাড়ি। নাম রিজিয়ালয়। বাবা নাম রেখেছিলেন এ বাড়িটি মায়ের নামে।

আমি এই নামফলকটি বানিয়ে দিয়েছিলাম।

দেখলাম, তা আজো আছে। শুধু মলিন হয়ে গেছে সেই নামফলকটি।

আম, কাঠাল, পেয়ারা আর সুপারি বাগানের মধ্যে দাড়িয়ে আছে বাড়িটি।

সেই পুরনো কদবেল গাছটি এখনো তেমনি আছে।

রিজিয়ালয়কে আড়াল করে আরো দুটো ইমারত নির্মাণ হচ্ছে।

মায়ের ঘরে দরজায় এসে দাড়ালাম।

মাকে ডাকলাম।

মা, মাগো, আমি এসেছি।

বাবাকে ডাকলাম।

আমি এসেছি বাবা।

বড় ভাই দরজা খুললেন।

আমাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে কাদলেন।

বললাম, মা কোথায়, বাবা কোথায়?

ভাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

বড় আপা এলেন, আদর করলেন, কাদলেন।

বললাম, মা কোথায়, বাবা কোথায়?

আপাও শুধু তাকিয়ে রইলেন। কথা বললেন না আর।

তারপর, সহসা আমার মনে হলো মা–বাবার সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটির কথা।

আমার অগ্রজ এবং বন্ধু, ডাক্তারভাই।

বাড়ি ছেড়ে গেলে, তার কাছেই তো মা–বাবার থাকার কথা।

এ বাড়ি থেকে অনতি দূরে তার বাড়ি।

ত্রস্তগতিতে চললাম সেই দিকে। মাকে দেখার সাধ কতোকাল পরে।

দরজায় কড়া নাড়লাম। খুলে গেল দরজা।

লম্বা দাড়ি, ঠিক যেন বাবার মতো মনে হলো। খানিকটা অপ্রস্তুত হলাম।

ভুল ভাংলো, ডাক্তারভাই দাড়িয়ে। আলিঙ্গন করলাম।

মা–বাবা কেমন আছেন, কোথায় আছেন? প্রশ্ন করলাম।

ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

বললেন, ভালো আছেন, ঘুমাচ্ছেন।
তারপর ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে গেলেন মা–বাবার ঘরে।
দেখি, কি অপরূপ সুন্দর দৃশ্য! আমার মা–বাবা, গভীর নিদ্রায় পাশাপাশি।
সবুজ ঘাসের নিচে। ওপরে সোনার পালঙ্ক।
মায়ের পালঙ্কে খচিত রিজিয়া বেগম, গোপালপুর, বড়বাড়ি, মৃত্যু ২৩ মার্চ ১৯৯৮।
বাবার পালঙ্কে খচিত মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, গোপালপুর, বড়বাড়ি, মৃত্যু ২ আগস্ট ১৯৯৮।
চারদিকে পাখির কুজন।
সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা সবুজ লতানো ঘামগুলো মা–বাবার পালঙ্কে মিষ্টি বাতাসের দোলা দিয়ে যাচ্ছে।
পাশেই একটি সরু খাল প্রবাহিত।
মাকে ডাকলাম, বাবাকে ডাকলাম। চিৎকার করে ডাকলাম, কাদলাম।
কথা বলো মা, বাবা তুমি কথা বলো।
দেখো তোমাদের জন্য একটি কালো পাসপোর্ট নিয়ে এসেছি।
মা–বাবা কথা বললেন না, তাকলেন না, অভিমানে চোখ খুললেন না।
ঘুম ভাঙালেন না এবং ভাঙাবেন না আর কোনোদিন।
ফিরিয়ে দিলেন আমার পাসপোর্ট।
আমার আর কথা বলা হলো না। হবে না আর কোনোদিন।
কালো পাসপোর্টটি আমাকে শেষ কথা বলতে দিল না।
কালো পাসপোর্টটি আমাকে শেষ কথা শুনতে দিল না।

আট বছর আগের –
সেই মিথ্যা খবরটি আজ রূপান্তরিত হলো সত্যে।
অবিশ্বাস রূপান্তরিত হলো বিশ্বাসে।
নয়নধারা সমর্পিত হলো আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

হিউস্টন, আমেরিকা থেকে
jahan_reza@yahoo.com

ইন্টারভিউ

– জাহাঙ্গীর আলী

যে সংস্থাটির সঙ্গে দীর্ঘ দিন জড়িত সেখানে একজন একাউন্টেন্ট নিয়োগ করা হবে। সেই নিয়োগ বোর্ডে আমিও একজন সদস্য। এ অমানবিক কাজটি করতে ইদানীং আর ভালো লাগে না। বেকারের এ দেশে নিয়োগ ইন্টারভিউ মানেই তো হাজারও প্রার্থীর মধ্যে সৌভাগ্যবান (!) একজন বাদে বাকিদের নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়া। করুণ কাহিনীর ঝোলা বৃদ্ধি করা। এক বোঝা বেদনা নিয়ে ফেরা। অনেক সময় অপ্রীতিকর কাণ্ডকারখানা ঘটা।
প্রার্থীর সংখ্যা সীমিত। মাত্র নয়জন। খুব একটা অসুবিধা হবে না বলে সংস্থাপ্রধান জানালেন।
সংস্থার একাউন্টেন্ট অন্যত্র চলে যাওয়ায় সেই শূন্য পদে আজকের এই ইন্টারভিউ। নয়জন প্রার্থীর মধ্যে পাচজন মহিলা আর চারজন পুরুষ।

চাকরির বাজারে মহিলারা এখন ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। একাউন্টস জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আনকোরা কাউকে নেয়া যাবে না, সংস্থাপ্রধান সেটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ছেলেদের মধ্যে একজন পাওয়া গেল যার অভিজ্ঞতা ও পারফরমেন্স বেশ ভালো।

ছেলেদের পর মেয়েদের ইন্টারভিউ। এভাবেই আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তেমন কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রশ্নের সঠিক জবাবই মেলে না, হিসাব-নিকাশের বিষয়টা তো আরো শক্ত। অধিকাংশ প্রার্থীই বলতে পারে না তাদের বিভাগে মোট কয়টি জেলা। এর নামগুলো তো আরো পরের ব্যাপার।

সবার শেষে যে প্রার্থীর ডাক পড়লো, হুড়মুড় করে ঝড়ো বাতাসের মতো ঘরে ঢুকে সৌজন্য বোধ ছাড়াই ধপাস করে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর ব্যাগ থেকে টিসু পেপার বের করে মুখের কড়া প্রসাধনী মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পা দোলাতে দোলাতে জানালেন, তার মনটা ভীষণ খারাপ। আসার পথে ব্যাগে রাখা কয়েক হাজার টাকা খোয়া গেছে।

কথাটা শুনে সবাই আফসোস, সহানুভূতি জানালাম।

চিকন রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা আটা বাইশ তেইশ বছরের কড়া প্রসাধনীর চাপা রঙের যুবতীটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

তার চোখের মণির অস্থিরতা আর দ্রুতলয়ে পায়ের দোল খাওয়া দেখে সহানুভূতি কিছুটা হলেও ধাক্কা খেলো। নাম তার রুবিনা আলম পেস্তা। রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে এবারে ইতিহাসে এমএ পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট এখনো বের হয়নি। বাড়ি পাশের জেলায়। দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের শহরতলির বাসায় থাকে।

কথাগুলো বলতে বলতে সে এক কাণ্ড করে বসলো। লাফিয়ে উঠে শোকেসের ওপর রাখা কাঠের একটা সুভেনির যা কোনো এক রাজনৈতিক দলের প্রতীকের মতো সকলকে দেখিয়ে বলে উঠলো, আপনারা বুঝি এর সমর্থক? আমিও এ দলের। কলেজে এতো দিন এ দলেরই সাংগঠনিক সম্পাদিকা ছিলাম।

কথাগুলো বলতে বলতে সারা মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো। সঙ্গে পা দোলানোর মাত্রাটা আরো বৃদ্ধি পেল। কৌতূহলী হয়ে বোর্ডের এক সদস্য জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনি তো রাজনীতিতে পারদর্শী। অনেক খবরাখবর রাখেন, কয়েকদিন আগে বিশ্বে যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কানকুন সম্মেলন হয়ে গেল এটা কোথায় এবং কেন হয়েছিল বলতে পারেন?

কথাটা শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। উত্তর তো দূরের কথা, এ ধরনের নাম জীবনে প্রথম শুনলো বলে মনে হলো। মুখটা একটু বিকৃত করে উল্টো আমাদেরই জিজ্ঞাসা করে বসলো, কা-ন-কু-ন? এমন নাম তো কখনো শুনিনি। মনে হয় *চিন, টিন* কোথাও হতে পারে, তাই না?

তার ভাবভঙ্গি ও আবোল-তাবোল বচনে সবাই ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। আর কোনো প্রশ্ন নয়। সে গেলেই যেন সবাই স্বস্তি পায়। তাই বলা হলো ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন।

জবাব পাওয়া মাত্র ব্যাগটি কাধে ফেলে সবার উদ্দেশে জানিয়ে দিল চাকরির তার খুব একটা প্রয়োজন নেই। তবে বাড়িতে বসে থেকে ভোর হয়ে যাচ্ছে বলে শুধু সময় কাটাতে চায়। কথাগুলো জানিয়ে পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে, হাই হিলের শব্দ তুলে, টা টা ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে রুবিনা আলম পেস্তা নামের চাকরিপ্রার্থিনী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

তার গমন পথের দিকে সবাই চেয়ে রইলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডে এ ধরনের প্রার্থী জীবনে এটাই প্রথম।

ইন্টারভিউ শেষে সাব্যস্ত হলো অফিসের কাজ চালানোর জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একমাত্র পুরুষ প্রার্থীই সব দিক থেকে যোগ্য। সংস্থাপ্রধানেরও তাকে পছন্দ। অফিস ও বাইরের কাজের সেই-ই সবচেয়ে উপযুক্ত।

সবাই তার নিয়োগ দানের সুপারিশ স্বাক্ষর করে বিদায় নিলাম।

রাত দশটার পর হঠাৎ টেলিফোন। অপরপ্রান্ত থেকে সংস্থাপ্রধানের ভার ভার গলা। কোনো দুর্ঘটনা নয়তো? উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলাম।

হ্যা, দুর্ঘটনা তো বটে। বললেন, আজকের ইন্টারভিউতে সবার চেয়ে কম নাম্বার পেয়ে যে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান সেই পেস্তাকে নিয়োগ দানের জন্য চাপ এসেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতার খায়েশ। প্রার্থী যদিও তার বিপরীত আদর্শের সমর্থক।

কথাটা শুনে কোনো জবাব মুখে এলো না। মনে মনে ভাবলাম অযোগ্য, অপদার্থ দ্বারা এভাবেই দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতাবানদের খায়েশ মেটাতে এভাবেই দেশ আজ ডুবছে। মেধাবীদের বাদ দিয়ে মেধাহীন অপদার্থদের গুরুত্বপূর্ণ বদে বসাচ্ছি। দেশের বারোটা বাজাতে সহায়তা করছি। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সামনে নয়, পেছনে দ্রুত চলছি।

রাজশাহী থেকে

একটি সাধারণ ক্ষমা

– সাগর

তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমরা থাকতাম পাচ তলায়। সবেমাত্র নতুন বাসায় ওঠা। অনেক অপরিচিত মুখ আসা–যাওয়া করে পরিচিত হয়ে উঠছে। হঠাৎ করেই এক বিকেলে তিনি এলেন। আমার এক ক্লাস উপরে পড়েন। থাকেন আমাদের নিচে চার তলায়। তিনিও কমার্সে, আমিও কমার্সে। তাই মাঝে মধ্যে বই দেয়া–নেয়াটা কেমন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে তিনি ময়মনসিংহে অনার্সে ভর্তি হলেন। এরপর তার ব্যগ্রতা যেন আরো বাড়লো। বাসায় এলেই কোনো রকম ব্যাগ রেখে ছুটে আসতেন স্রেফ দেখা করার জন্য। আমার স্বল্প জ্ঞানে বুঝতে পারি, তিনি আমার প্রতি তার সব দুর্বলতা প্রকাশ করে আমাকে দুর্বল করতে চাচ্ছেন।

ততোদিনে অবশ্য আমিও অনেক নদী জল সাতরে তার কাছাকাছি পৌছার চেষ্টা করছি। কিন্তু সাহসের অভাবে পারছি না। সুযোগ এলো সে বছর রমজানের ঈদে।

ঈদের আগের রাতে নয়টার দিকে কমপিউটারে গান শুনছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আলতো করে জড়িয়ে ধরলেন। মুখ ফেরাতেই দেখি তিনি চোখ মুখে দুষ্টামি ভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। বললেন, কাল রাতে ঠিক এই সময় বাসায় আসবি, আমি শাড়ি পরবো।

তিনি জানতেন মেয়েদের পোশাকের মধ্যে আমার প্রথম পছন্দ শাড়ি এবং অবশ্যই গ্রামীণ চেকের।

আমরা থাকতাম কলোনিতে। তাই বেড়ানোর জায়গা বলতে ছিল এ বাসা ও বাসা। আমি ও আমার বন্ধুরা ঘোরাঘুরি না করে চুটিয়ে আড্ডা দিতাম পার্কে বসে। ঈদের রাতের আড্ডা হতো বেশ লম্বা। আয়োজনও থাকতো বেশ। তাই বিভ্রান্তিতে ভুগছিলাম এই আড্ডা ছেড়ে তাদের বাসায় গেলে আনন্দটা কমে যাবে কি না এটা ভেবে। তাছাড়া তাদের বাসার উপরে যেহেতু আমাদের বাসা, তাই রাত নয়টায় বাসার ফিরতে এক দম মন চাচ্ছিল না। তবুও কিসের যেন একটা তীব্র আকর্ষণে বন্ধুদের মিথ্যা কথা বলে তাদের বাসার গেট পর্যন্ত পৌছালাম।

কলিংবেল চাপতেই তিনি গেট খুললেন। অভিমানের হাসি নিয়ে বললেন, এতোক্ষণ পর আসার সময় হলো! আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

হতবাক হয়ে বললাম, কেন, আমার তো নয়টার সময়ই আসার কথা ছিল।

তিনি কিছু না বলে অন্য রুমে গেলেন। ফিরলেন এক গাদা শাড়ি হাতে নিয়ে। শাড়িগুলো টি টেবিলের ওপর রেখে বললেন, কোনটা পরলে সুন্দর লাগবে?

পরিস্থিতি দেখে আমার ভীষণ ভয় করছিল। কারণ ততোক্ষণে বুঝে গেছি তাদের বাসায় তিনি ছাড়া কেউ নেই আর ওই সময় যদি আমাদের বাসা থেকে কেউ তাদের বাসায় আসে তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারে।

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, আপু, বাসায় কেউ নেই?

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, সেটা জেনে তোর কি কাজ? কোনটা পছন্দ হয়েছে বল?

পার্পল রঙের শাড়িটাতে আমার চোখ আটকে যাওয়া দেখে তিনি বুঝলেন আমি কোনটার কথা বলতে চাই। সবগুলো শাড়ি হাতে নিয়ে বললেন, এখানেই বসে থাকবি, একদম নড়বি না। আমি পাচ সাত মিনিটের মধ্যে শাড়ি পরে আসছি।

বসে বসে ভাবছি ঈদের এ নতুন অভিজ্ঞতার কথা। কিছুক্ষণ পর বেডরুমে তার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি ডাকছেন, একটু এদিকে আয় তো।

ভয়ে ভয়ে বেড়ালের মতো গেলাম বেডরুমের দরজা পর্যন্ত। দেখলাম তিনি এক হাতে শাড়ি, অন্য হাতে অনাবৃত বুক আচলে ঢাকার চেষ্টা করছেন।

আমাকে দাড়ানো দেখে বললেন, ইশ, আমার লাজুক লতা রে! এদিকে আয়, একটু কুচিটা ধর, একদম সামলাতে পারছি না।

আমাকে কে যেন স্থির বানিয়ে ফেলেছে ততোক্ষণে, একদম নড়তে পারছিলাম না। অর্ধনগ্ন তাকে ঝাড়বাতির আলোয় তাকে অস্বাভাবিক সুন্দর লাগছিল। ভীষণ ইচ্ছা করছিল তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে। কিন্তু কিসের যেন একটা ভয়ে পারছিলাম না। মাথা নিচু করে শাড়ির এক প্রান্ত ধরে দাড়িয়ে আছি, তিনি কুচি ঠিক করে শাড়ি পরার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মুহূর্ত খানেক পরে বললেন, এদিকে দেখ।

তাকাতেই হাজার পাওয়ারের বেশ কয়টা বাল্ব যেন আমার চোখে ঠিকরে পড়লো। আস্তে আস্তে দৃষ্টি বিভ্রম কাটতেই দেখি সামনে দাড়িয়ে আছেন এক জীবন্ত ভেনাস! তার পাশে পড়ে থাকা শাড়িটার এক প্রান্ত তখনো আমার হাতে ধরা। আমার চোখ স্থির তার পুরো শরীরে। নিষ্ক্রিয় হয়ে দাড়িয়ে আছি।

এরপর আমাকে সক্রিয় করতে অবশ্য তিনি বেশি সময় নেননি।

একেবারেই নতুন ছিলাম এ ব্যাপারে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো দেখে যা শিখেছি সেটুকুই সম্পদ। তাকে বেশ অভিজ্ঞ মনে হলো।

সব মিলিয়ে অসাধারণ সুন্দর ছিল ঈদের ওই রাতটি আর সব বাদ দিয়ে সবচেয়ে টেস্টি ছিল তার চিকন পাতলা দুটি ঠোট। তার পুরো শরীরে ছিল একটা ভুরভুরে গাঢ় সুগন্ধ যা অনেকক্ষণ আমাকে নেশার ঘোরে রেখে ছিল। এক পর্যায় প্রশ্ন করেছিলেন কেমন লাগছে?

উত্তরে শুধু বলেছিলাম, খু-উ-ব ভালো!

এরপর বেশ কয়টা ঈদ চলে গেছে। কিন্তু ওটার মতো একটাও নয়।

ওই ঈদের দেড় মাস পরে আপুর বিয়ে হয় অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী এক খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে। ছয় মাস পর আপু চলে যান তার বরের সঙ্গে। ইচ্ছা করলে লেখাটা *শাড়ি* সংখ্যায় পাঠানো যেতো। কিন্তু আপুর কড়া নিষেধ ছিল, আমাদের একান্ত এ অনুভূতি কাউকে জানানো যাবে না। জানালে আর এমনটা হবে না কখনো।

এরপর অজানা একটা ভালো লাগা থেকে নিজের ভেতর অনেক দিন জমে আছে সে অনুভূতিটা। যাযাদির লেখকদের অনুভূতিগুলো পড়তে পড়তে তাদের কাছে বেশ ঋণী হয়ে গেছি। এবার নিজের অনুভূতিটা সবাই জানুক।

আপু যদি কখনো এই লেখাটা পড়েন তাহলে তার কাছে ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই চাইবো না, কখনো না।

হলুদ পাখি

– স্যামু ফারুক

বছর দুয়েক আগে আমার এই বন্ধুটি মোবাইলে একটা অজ্ঞাত পরিচয় মেয়ের সঙ্গে কথা বলতো। এ ব্যাপারে কৌতূহল দেখাতাম না।

এক সময়ে বন্ধু আমাকে জানালো, দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোনো এক খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটি কলেজে মেয়েটি ইংরেজিতে অনার্স ফাইনাল দিচ্ছে। বাবা অ্যাডভোকেট। মেয়েটি বড্ড বেশি সুন্দরী। তাতে দেমাগও খুব, বশ মানানো যাচ্ছে না। আপনি একটু হ্যান্ডল করেন।

এভাবেই হলুদ পাখির সঙ্গে আলাপ শুরু যার অধিকাংশ প্রশ্নই থাকতো ওই বন্ধুকে নিয়ে।

সততার সঙ্গে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতাম। বন্ধু বলে কখনো এক রত্তি বাড়িয়ে যেমন বলতাম না। ঠিক তেমনিভাবে জেলাস হয়ে আমার বন্ধুর সম্পর্কে নিন্দা–মন্দও করতাম না।

একটা সময়ে আমাদের এ আলাপচারিতা নির্মল বন্ধুত্বে রূপ নেয়।

আমার বন্ধুকে নিয়ে আমার হলুদ পাখির চূড়ান্ত ও সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল, ভাইয়া, আপনার যদি অবিবাহিতা কোনো বোন থাকতো, আর আপনার বন্ধু জীবন সঙ্গিনী করার জন্য আপনার কাছে চাইতো তাহলে আপনার বন্ধুকে দিতেন আপনার সেই বোন? খুব ভেবে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন। মনে রাখবেন, আপনার উত্তরের ওপর নির্ভর করছে আপনার বন্ধুর সঙ্গে প্রেম, বিয়ে, সম্পর্ক রাখা না রাখা ইত্যাদি।

উত্তরে বললাম, ভাবনার কিছু নেই। আমার বোন যদি থাকতো আর আমার বন্ধু চাইতো নির্দ্বিধায় তাকে দিয়ে দিতাম।

কেনই বা এ কথা বলবো না। বন্ধুটি তখন দানে, ধ্যানে, এলাকার উন্নয়নে, শিক্ষা প্রসার কর্মসূচিকে কিভাবে আরো বাস্তবমুখী করা যায় সেসব নিয়ে শুধু চিন্তার মধ্যে না থেকে বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকতো। সরকারি সাহায্য হয় না, পায় না এমন চার চারটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করতো। এমন মানুষটিকে নিজের বোন বিয়ে না দেয়ার নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলেছিলাম, ভাবনার কিছু নেই।

আমার সম্মতি পেয়ে আমারি পাখি তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভুলটি করে। বাবা, মা, চাচাদের মতামত উপেক্ষা করে পারিবারিক মানসম্মানের মুণ্ডুপাত করে কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলে। এ সিদ্ধান্ত যে কতো বড় ভুল ছিল তা বুঝতে আমার পাখিকে বেশিক্ষণ দেরি করতে হয়নি। বিয়ের রাতেই আবিষ্কার করে তার স্বামী প্রবরটি নপুংসক। একেবারেই যৌন চেতনা রহিত। এ লজ্জা, এ দুঃখ, এ অপ্রাপ্তি কাকে বলা যায়? যার ভয়ে এলাকার চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বদমাশ হয় ভালো হয়ে যায়, অথবা অন্য এলাকায় আশ্রয় নেয়, বাহ্যিকভাবে দেখতে অত্যন্ত সুঠাম ও বিশালদেহী সেই মানুষটি বিছানায় কতো অসহায়। ও দিকে বাপের বাড়িও ছেড়ে এসেছে, সেখানেই বা কোন মুখে ফিরে যায়?

সবদিক ভেবে–চিন্তে আমার হলুদ পাখি একজন দায়িত্বশীল স্ত্রীর মতো তার সদ্য বিয়ে করা স্বামীকে সাহস যোগায় এই বলে, এটা হয়তো সাময়িক অসুবিধা, সমস্যা প্রকট আকার ধারন করার আগেই চলো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই।

বন্ধুটিও সুবোধ বালকের মতো তাই করে। কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা দিল। অমনি তিনি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আবার যা তাই।

একটা চব্বিশ পচিশ বছরের পূর্ণ যুবতী কোনো স্ত্রীর পাশে স্বামী শুয়ে থাকবে আর সে মাসের পর মাস তসবিহ জপতে থাকবে তা তো হয় না! অবশেষে লাজ–লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন আমাকে বলেই ফেললো। আপনার বন্ধুর এই এই সমস্যা।

উপরে আল্লাহ, নিচে আপনি। আপনাকে ছাড়া কারো কথা তো শোনে না। সুতরাং যা করার আপনাকেই করতে হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এমন গভীর, গোপন ব্যাপার আমি জানলাম কি করে? এমন একটা প্রশ্ন এসেই যায়। কিভাবে প্রসঙ্গটা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারি তাই ভাবছি। এমন সময় বন্ধুই একদিন বলেই বসলো, ভাই, লজ্জার কথা কি আর বলবো, আমার লিঙ্গোত্থানই ঘটে না। যাও কসরৎ করে উত্থান ঘটলো তাও স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় না। তদুপরি উপগত হওয়ার মতো অবস্থা (শারীরিক) তৈরি হয় এক মাসে, দেড় মাসে। এখন কি করতে পারি?

তাকে মনোবল না হারানোর জন্য বলি। তাৎক্ষণিকভাবে খাটি মধু এবং কালো জিরা সেবন করতে দিই, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক চিকিৎসক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাই। অল্প কয়েকদিনে অভাবিত উন্নতি দেখা যায়।

আমার হলুদ পাখি অকুণ্ঠচিত্তে আমার জন্য দোয়া করতে থাকে আর বলে, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত, বন্ধুরা অবৈধ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যি আপনি মহৎ, আপনার এ ঋণ শোধরানোর নয়।

কিন্তু পুরোনো অভ্যাস মাফিক বন্ধুটি আবার ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। আমার হলুদ পাখির এতো সুখ সইবে কেন?

ইতিমধ্যে আমার নিজের সংসারটাও গেল ভেঙে। আমার কষ্ট, আমার হলুদ পাখির কষ্ট দুজনকে কখন যেন এক করে দিয়েছে। প্রথম থেকেই আমাদের দুজনের পছন্দ, অপছন্দ, রুচি, মানসিকতার খুবই মিল ছিল। তার উপর আমার সমস্যাটা হয়তো ওকে আরো বেশি সমব্যথি করে তোলে। এক পর্যায়ে আমরা উপলব্ধি করি, হলুদ পাখির জন্ম তো মূলত আমার জন্য। ডাক পিয়ন যেমন ভুল করে শফিকুলের চিঠি সফিউদ্দিনকে দিয়ে দেয় তেমনি আমার পাখিও ভুলক্রমে অন্যের ভাগে চলে গেছে। পাখির অভিযোগ, তোমার দেয়া মতামতই আমার এ দুরবস্থা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তুমিই দায়ী। দেরি না করে এ নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করো।

কিন্তু হায় আফসোস! আমার যে গত একটি বছর থেকে শনির দশা চলছে। ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বরবাদ। ন্যূনতম সচ্ছলতার মধ্যে তো ওকে রাখতে হবে! তার উপর আমার ওই বন্ধুটিই বা কি ভাববে যে আমাকে ভাইয়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে? পীরের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে। কিভাবে তার মনে এতো বড় কষ্ট দিই।

ওদিকে আমার হলুদ পাখির দুরবস্থা আমাকে অস্থির করে, কাদায়। ওর কিছু হলে বেচে থাকা যে আমার জন্য ভীষণ কষ্টকর হবে।

খুলনা থেকে

চিনি অভিযান

– সুফিয়া বেগম

গ্রামের সবার কাছে ফডো মিয়া একটি পরিচিত নাম। তবে এটা তার আসল নাম নয়। কিভাবে মা বাবার দেয়া ফটিক নামটি *ফডো* মিয়ায় আড়াল হলো তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। হাবাগোবা ধরনের ফডো মিয়াও কোনোদিন এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

দেখতে বেটে, গোলগাল ধরনের ফডো মিয়ার বয়স বড়জোর বিশ বছর হবে। তবে গ্রামের মানুষের ভারবাহী কাজ করতে করতে তার শরীরের চিত্র যেখানে এসে দাড়িয়েছে সেখান থেকে তার বিশ বছরের আসল চেহারা খুজে বের করা কঠিন। সামান্য ভিটেমাটিটুকু সম্বল করে অন্যের বাড়িতে শরীর খাটিয়ে যা পায় তা দিয়ে মা ছেলের সংসার চলে যায় কোনো মতে।

যে যে কাজের জন্যে ডাকুক না কেন, ফডো মিয়া এসে হাজির হয়। অবলীলায় মাথায় তুলে নেয় দুই মণ ওজনের বস্তা। যে যে কাজই করাক না কেন, আগে তাকে ভরপেট খাবার দিতে হবে পঞ্চব্যঞ্জন না হোক, ভালো ব্যঞ্জন দিয়ে। খাওয়া শেষে হাতে দিতে হবে এক প্যাকেট চুরুট আর একটা ম্যাচ। ব্যাস, এতেই খুশি ফডো মিয়া। এরপর ভার বহনের মজুরি তাকে যাই দেয়া হোক না কেন, কোনো উচ্চবাচ্য করবে না সে।

তবে এর ব্যতিক্রম ঘটলে ফডো মিয়া কি করতে পারে তা শুনলে চমকে না উঠে পারা যায় না।

মির্জাবাড়ির বড় মির্জার চল্লিশা হবে। বিরাট আয়োজন। ফডো মিয়ার ডাক পড়ে কাজের জন্য।

ফডো মিয়াও হাজির। কাজে হাত দেয়ার আগে ফডোর জন্য খাবার আসে। সকালের বাসি ভাতের সঙ্গে একদলা আলু ভর্তা।

প্রচণ্ড ক্ষিধের তাড়ায় ফডো মিয়া তাই খায়। খাওয়া শেষে চুরুট আর দিয়াশলাই চেয়েও পায়নি।

মনে মনে ফন্দি আটে ফডো মিয়া। একটা শিক্ষা দিতে হবে এদের। তক্কে তক্কে থাকে সে। কাজের ফাকে সুযোগ খোজে।

সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাবুর্চিরা।

ব্যস্ততা বেড়ে যায় ফডো মিয়ারও। এটা আনো রে, ওটা আনো রে, পুকুর থেকে পানি তোলো রে ইত্যাদি হরেক রকমের কাজ। ফডো মিয়াও কাজ করে যাচ্ছে নীরবে।

চিনি ভর্তি দশ কেজি ওজনের ব্যাগটা হাতে নিতেই বুদ্ধিটা খেলে যায় তার মনে। ব্যাগটি নিয়ে বাবুর্চিখানার দিকে না গিয়ে সোজা চলে যায় পুকুর ঘাটে। সন্ধ্যার ঘনায়মান আধারে পুকুর ঘাটটা তখন সুনসান নীরব। ফডো মিয়ার জন্য এটা একটা ভালো সুযোগ। চিনি ভর্তি ব্যাগটা পানিতে ডুবিয়ে হাতল দুটো খুটির সঙ্গে এমনভাবে বেধে রাখে যে, কেউ ঘাটে এলেও আলো-আধারিতে সহজে কারো চোখে পড়বে না ব্যাগটা। মনের ভেতর এক ধরনের তৃপ্তি কাজ করে ফডো মিয়ার। কেমন জব্দ করা গেল! কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না চিনি চুরির কথা। রাতে বাড়ি ফেরার সময় ব্যাগটা নিয়ে গেলেই হলো।

সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মতো আড্ডা জমে মাজু শেখের বাড়িতে। ফডো ছাড়া এই আড্ডা যেন প্রাণহীন। সেদিন ফডো আসে দেরি করে। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সবাই এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ফডো মেলে ধরে তার চিনি চুরির কাহিনী।

ফডো বলে, মিয়াভাই, আমার মন থেকে একটা দ্বন্দ্ব কিছুতেই কাটছে না।

কি দ্বন্দ্ব ফডো?

মিয়াভাই, ব্যাপারটা হলো, মির্জাবাড়ি থেকে এক ব্যাগ চিনি বাড়ি নেয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম পুকুরঘাটে। এমনভাবে ব্যাগটা পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলাম যাতে কারো চোখে না পড়ে। রাতে ব্যাগটা নিতে গিয়ে দেখি ওটা খুটির সঙ্গে বাধা আছে। কিন্তু ভেতরে কিছুই নেই। সেই থেকে ভাবছি আমার চেয়েও বুদ্ধিমান কে আছে? যেভাবেই হোক, তাকে খুজে বের করতে হবে। আমি পুলিশে খবর দেবো।

এই কাজটা করলে তুই নিজেই ধরা পড়বি ফডো। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসা করে তুই চিনি কোথেকে পেলি, তখন কি বলবি?

সত্যিই তো? পুলিশ তো আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে। এই বুদ্ধিটা তো আমার মাথায় আসেনি। দরকার নেই থানা পুলিশ করার। আমিই খুজে বের করবো সেই চোরকে। চোরের উপর বাটপাড়ি করার মজাটা তাকে বুঝিয়ে দেবো।

সবাই এক বাক্যে ফটিককে সমর্থন করে।

ঢাকা থেকে

অনুভবে

– এসএ স্বপ্ন

যাযাদি ঈদ সংখ্যা? দেখেই বুকের ভেতর তীব্র কষ্ট হানা দিল। গত ঈদ সংখ্যাটা কিভাবেই বদলে দিয়েছে আমার ভেতরটাকে সে কথা নিয়েই যাযাদিতে আমার প্রথম লেখা এটি। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে নিজের সম্পর্কে একটু বলে নিচ্ছি।

আমি স্বপ্ন। বিবাহিত। এক সন্তানের মা। বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ, গল্পপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, দায়িত্ব সচেতন আনন্দময়ী এক রমণী। দেখতে আহামরি সুন্দরী না হলেও সুন্দর মনের অধিকারী ছিলাম। আনন্দ উচ্ছলতায় সব সময়ই আমার চারপাশটাকে ঘিরে রাখতে পছন্দ করতাম। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে বিয়ে হলেও বিবাহিত জীবনেই স্বামী, সন্তান আর সংসারের প্রতি নিপুণ দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি একটি নামি ইউনিভার্সিটি থেকে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করে বর্তমানে কর্মজীবনে ব্যস্ত।

বন্ধুরা বলতো, তুই পারিস বটে! বন্ধু মহলে আমি মান্না-দের *কফি হাউস* গানের সুজাতা নামেই বিখ্যাত। আড্ডার উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার অফুরন্ত হাসি আর অসম্ভব প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য।

জীবনটা আনন্দ উচ্ছলতায় ভালোই কাটছিল। বিপত্তি বাধলো এ বছর যখন যাযযাদি-র গত ঈদ সংখ্যায় শ্রাবণের লেখা পড়ে তাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই মেইল করেছিলাম। শ্রাবণ আমেরিকার এক নামি ইউনিভার্সিটিতে এমএস করছে। আমার সমবয়সী, অবিবাহিত, মেধাবী এক তরুণ। ও আমার মতোই আড্ডাবাজ আর বন্ধুবৎসল।

অল্প দিনেই মেইল থেকে চ্যাট, ফোনালাপ এবং গভীর বন্ধুত্ব হলো ওর সঙ্গে। মাত্র দুমাসেই আমরা অনেক কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলাম। অফিস শেষে প্রায়ই আমি অনলাইনে ওর সঙ্গে দুই তিন ঘণ্টা গল্প কথায় হাজার মাইলের আকাশ সীমার দূরত্ব অতিক্রম করতাম। কতো রাজ্যের গল্প হতো আমাদের। এমনকি ফোনেও প্রায়ই গল্প হতো। কখনো সেটা ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেতো।

এভাবেই অনলাইনে আর ফোনে চলতে চলতে মাত্র তিন মাসের মাথায় আমি আবিষ্কার করলাম শ্রাবণ আমায় গভীর ভাবেই ভালোবেসে ফেলেছে! প্রথম যেদিন সে বললো, তার অবস্থা খুব খারাপ, সে তার সব কিছুতেই আমার অবাধ বিচরণ দেখতে পায়, পড়া, খাওয়া, ঘুম এমনিক স্বপ্নেও আমি তার ভেতরে হানা দিই তখন বিস্মিত হয়েছিলাম। আমার ভেতরটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল। কারণ ও আমার পরিবারে পরিচিতজন হয়ে গিয়েছিল। আদ্যোপান্ত সবাই জানতো। কাফে-তে বসেই আকুল হয়ে কেদে ফেলেছিলাম। মায়ায় ভেসে গিয়েছিল আমার ভেতরটা।

সব জেনে সহানুভূতি আর মমত্ব বোধ থেকেই ওর সঙ্গে অনলাইনে হাটছিলাম, ফোন করাটাও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি নিজের ফাদে নিজেই আটকা পড়তে যাচ্ছি।

এভাবে চ্যাট, ফোন করতে করতে নিজেকেই আবিষ্কার করলাম ওর ভালোবাসার জালে। দুজন দুজনকে গভীরভাবেই ভালোবেসে ফেললাম। অবস্থা এমন দাড়ালো, ওর চেয়ে আমার অবস্থাই কাহিল হলো। আমার অস্থিরতা বেড়ে গেল ওর জন্য। আমরা অনুভূতিতে এতোটাই কাছে চলে গিয়েছিলাম, দুজন দুজনার অস্থিরতা টের পেতাম। হয়তো ওর কথা ভেবে রাতে ঘুমাতে পারিনি, দেখা গেছে ওই রাতে শ্রাবণও ঘুমাতে পারেনি। আমি অস্থির হলেই ও মোবাইলে মেইল করতো। রাতে মাঝে মধ্যে চোখ বন্ধ করে একা বলতাম, শ্রাবণ আমায় ফোন করো, প্লিজ ফোন করো। দেখা যেতো ঘণ্টা খানের মধ্যেই মোবাইলে ভেসে এসেছে সেই কণ্ঠ যা আমাকে বিবশ করতো।

আমরা বাস্তবে কেউ কাউকে দেখিনি। ওয়েব ক্যামেরায় আর ছবিতে দেখেছি। তারপরও কি গভীর ভালোবাসায় যে দুজন ভেসে গেলাম তা আজও রহস্যময়।

আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম আমাদের এই ভালোবাসা বোধটা অন্যায়। এর কোনো পরিণতি নেই। কেউ কাউকে চাইতে পারবো না কোনোদিন। তাই দুজনেই প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলাম।

আমরা আমাদের ভালোবাসা বোধ আর কষ্ট বোধ থেকেই সিদ্ধান্ত নিলাম সম্পর্কটা বন্ধুত্বেই সীমাবদ্ধ রাখার। তার একমাত্র উপায় হলো সব যোগাযোগ বন্ধ করা। আমার কষ্ট হচ্ছিল, বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল, তবুও আমরা সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম।

মাস খানেক হলো আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু আমার সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। শ্রাবণ কেমন আছে জানি না তবে আমি ভীষণ কষ্টে আছি। আমার সারাক্ষণই ওর কথা মনে হয়। একদিকে দীর্ঘ কয়েক বছরের সংসার, দেবতুল্য স্বামী আর নিষ্পাপ সন্তানের প্রতি আমার বিশ্বাসের স্খলন, অন্যদিকে আমার হৃদয়ে এখনো শ্রাবণের পূর্ণ অবস্থান আমাকে একদম বদলে দিয়েছে। থেমে গেছে আমার উচ্ছল তারুণ্যময় আমিটা।

এখন আমার রাতের পর রাত কেটে যায় নির্ঘুম। ওর কথা ভেবে কেদে ভাসাই চরাচর। চাকরিস্থলেও মন বসাতে পারছি না। কি কষ্ট, কি কষ্ট। যাকে কোনোদিন দেখিনি তার জন্য এ কেমন কষ্ট? যতো তাকে ভুলতে চাইছি ততোই কেন সে আমার রক্তকণায়, অনুভূতিতে মিশে যাচ্ছে ভেবে পাই না।

ব্যক্তিগত জীবনে এ পর্যন্ত কোনো অন্যায় করিনি। এমনকি সহসা মিথ্যা বলি না। সংসার জীবনে কোনো দায়িত্বই কখনো এড়িয়ে যাইনি। এখনো সবই নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে চেষ্টা করি। তবুও আল্লাহ কেন আমার মাঝে শ্রাবণের প্রতি এই রকম ভালোবাসা বোধের জন্ম দিয়েছে জানি না।

এখন মাঝ রাতে প্রার্থনায় ডুবে যাই। নামাজে কান্নায় ভেঙে পড়ি। বলি, আল্লাহ, আমায় ঠিক করে দাও। ওকে ভুলিয়ে দাও। আমায় মুক্তি দাও এই ভালোবাসা বোধ থকে। কিন্তু না, আমার মুক্তি হয় না। হয়তো ওর প্রতি আমার ভালোবাসা বোধ, অনুভূতি বোধটা অন্য রকম তাই। হয়তো এই ভালোবাসাটা চাওয়া-পাওয়ার হিসাব ছাড়িয়ে সীমাহীন আকাশের মতো বিস্তৃত বলেই আজো ওকে ভুলতে পারছি না।

অনুভবে ও এসেছিল, আজও অনুভবেই রয়ে গেছে।

ঢাকা থেকে

sapnow07@yahoo.com

ব্যতিক্রম

– সুমী

কল্পনা নয়, গল্প নয়, একদম সত্যি। বর্তমানে আমরা তিন বোন, দুই ভাই। আগে ছিলাম মেজ। আমার ছোট দুই বোন মারা যাওয়ায় এখন আমি ছোট। আমার জন্ম ২১ ডিসেম্বর। রাশিফল অনুযায়ী আমি ধনুর জাতিকা এবং দ্বৈত স্বভাবের।

সংসারে বিশেষ কারণে একই সঙ্গে সন্তানের মা ও বাবার কাজ করতাম এবং দুটি চরিত্রই সফলভাবে পালন করেছি। একটি কাজ ছাড়া ছেলেদের সব কাজই পারতাম। যেমন গাছে চড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, গোল্লাছুট, ডান্ডাবাড়ি, হাই জাম্প, লং জাম্প, সাতার ইত্যাদি। এর মধ্যে সুপারি গাছে বেশি উঠতাম কারণ আমার দাদি বলেছেন, মেয়েদের স্তন ওঠার আগে সুপারি গাছের সঙ্গে ঘষলে দেরিতে ওঠে। আরো বলতেন, আগে তাল (স্তন), পরে বাল (পিউবিক হেয়ার), তারপর লাল অর্থাৎ পিরিয়ড।

তখন মুরুব্বিদের কথাকে মনে হতো সংবিধান। দাদির এ কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং আমিও চাইতাম আমার যেন স্তন বড় না হয়। স্তন বড় হলে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে, দৌড়-ঝাপ দিতে পারবো না। তাই প্রতিদিন সুপারি, সুপারির খোল পাড়ার ছুতোয় স্কুলে যাওয়ার আগে-পরে ছুটির দিনে কেবল সুপারি গাছে উঠতাম। বুক ঘষতে ঘষতে বুকে দাগ পড়ে যেতো। খালি গায়ে উঠতাম।

আমার মা কতোবার বকেছেন সুপারি গাছে ওঠা নিয়ে। কিন্তু এ রহস্য আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না। সেই সময় হেটে হেটে কিছু লোক হজ করতে বেরুতেন। একজনের কাছে আট আনা পয়সা দিয়ে মনে মনে নিয়ত করেছি, আল্লাহ আমার স্তনগুলো যেন দেরিতে ওঠে বা না ওঠে, এ জন্য মক্কা শরিফ এই পয়সাটা দিলাম।

জানি না অলৌকিকভাবে হোক বা হরমোনজনিত কারণে হোক সত্যি সত্যি ছোট থেকে থেকে হঠাৎ তাল, বাল, লাল নিয়ে পরিপক্ক হই এসএসসি পরীক্ষার দুই মাস আগে। তখন বয়স পনেরো বছর ছয় সাত মাস হবে।

এখন হলে মা বাবা ডাক্তার দেখাতেন, উদ্বিগ্ন হতেন, আরো কতো কবিরাজি করতেন, কে জানে।

আমরা দশ বারোজনের একটা দল ছিলাম ছেলেমেয়েসহ। মেয়ের মধ্যে আমিসহ আরো দুজন। ওরা আমার চেয়ে বয়সে তিন চার বছরের ছোট। আমরা পড়ালেখা, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান এসব প্রতিযোগিতা করতাম। আমাদের কখনো আধুনিক, লোকগীতি, এসব গাইতে দিতেন না। অনুষ্ঠান হলে অতিথি শিল্প বা সিনিয়ররাও একই ধাচের গান গাইতেন।

আমরা নজরুলের বিদ্রোহী গান *এই শিকল পরা ছল, কারার ওই লৌহ কপাট, ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি, সালাম সালাম হাজার সালাম, একটি ফুলকে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি – এ ধরনের গান গাইতে পারতাম।*

প্রেমের গান, আবেগের গান এসব বাদ দিয়ে গান সিলেক্ট হতো। আমাদের কচিকাচার মেলা ছিল। এর জেলা ভিত্তিক পরিচালক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি সেন্সর করলে সেই গান গাওয়ার অনুমতি পেতাম।

আমার শিক্ষা জীবন কম্বাইণ্ড। তবে ক্লাস সেভেনে থাকাকালীন এক ছেলে আমার বইয়ের ভেতর একটা চিঠি রাখে। এই নিয়ে বিচার, সালিশ–দ্বন্দ্ব–সংঘাতে অনেক মেয়ের পড়া বন্ধ হয়। আমি তিন মাইল দূরে গার্লস স্কুলে চলে যাই। আমার আরেক বান্ধবী কুমিল্লা ফয়জুন্নেছায়। এভাবে মেয়েরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

অবশ্য ক্লাস নাইনের প্রথম দিকেই স্কুল কমিটি আবার মিটিং করে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের ফিরিয়ে আনেন। আমরা একই ব্যাচে মোট পয়তাল্লিশ জন ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিয়ে দুই একজন ফেল করে আর সবাই ভালো ফল করি।

আমরা খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতাম পড়াশোনা নিয়ে। ছেলেমেয়ে একত্রে পড়ার সুফল আমি পেয়েছি। কারণ এখানে মেধা বিকাশের সুযোগ বেশি।

আমার মেয়েদেরও আমি কো–এডুকেশনে উচ্চ শিক্ষিত করেছি, তাদের সন্তানদের প্রতিও আমার একই উপদেশ।

নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ তীব্র এটাই চিরন্তন। কিছু গাইডলাইন দিয়ে দিলে কো–এডুকেশনের সফলতাই বেশি। তবে আমাদের সময় আর এখনকার সময় আলাদা। আমরা (যৌনতা/দাম্পত্য) বিষয়ে কম জানতাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা টিভি/ডিশ দেখে অনেক গোপন বিষয়েও ধারণা পায়, মৌলিক জ্ঞান রাখে যেটা আমরা জানতাম না।

এর ভালো দিক যেমন আছে, মন্দ দিকও আছে।

হবিগঞ্জ থেকে

বর্জিত

– বাবুর বাবা

ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি ঈদ মানে হাসি, খুশি, আনন্দ। খুব ছোট ছিলাম তখন। পাচ ছয় বছর বয়স হবে হয়তো। আমি আর পাশের বাড়ির জুয়েল, মৌরি, সুস্মিত সবাই আগ্রহভরে অপেক্ষা করে থাকতাম ঈদের জন্য।

ঈদ এলেই শুরু হয়ে যেতো সালামির প্রতিযোগিতা। আশপাশের সব বাড়ি ঘুরে মুরুব্বিদের সালাম করে পাওয়া টাকাগুলো নিয়ে বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে হাটতাম। এটা-সেটা কিনতাম, ঘুরে বেড়াতাম। একটা অন্য রকম আমেজ।

১৯৯৮ সালে যখন মা মারা যান তখন বেশ বড় হয়েছি। বুঝতে শিখেছি। আমার পরের দুই বোনের বয়স তখন যথাক্রমে বারো ও দুই বছর। আর আমার উনিশ। মা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে ছিল ঈদ।

সকালে নামাজ পড়ে মায়ের কবর জেয়ারত করে বাসায় ফিরলাম। ধরে রাখতে পারিনি দুই চোখের পানি। চারদিকে খা খা করতে লাগলো। ছোট বোন দুটোর দিকে তাকিয়ে সামলে নিলাম নিজেকে।

মা বেচে থাকতেই পছন্দ করতাম মুন্নিকে। ওদের আর আমাদের গ্রামের বাড়ি ছিল এক জায়গায়। পারিবারিকভাবে চমৎকার সম্পর্ক ছিল দুই পরিবারের সদস্যদের মাঝে। আমার মা যখন মরণব্যাধি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত তখন থেকেই আমার মায়ের ছায়া খুজে ফিরতাম ওর মাঝে। খুব সাধারণ ছিল ওকে ঘিরে আমার স্বপ্নগুলো। মা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতেন তখন দেখেছি কিভাবে ও আমার মায়ের শুশ্রূষা করতো।

সেই ও যখন জানালো আমাকে ঘিরে ওর স্বপ্নের কথা তখন আকাশের চাদ হাতে পেলাম। একান্ত হয়ে গেলাম দুজনে। মাতৃহারা এই আমাকে শক্তি জোগাতো ও। স্বপ্ন দেখতাম প্রচুর। মাঝে মধ্যে ঈদে আমার শখের মোটর সাইকেলটা নিয়ে চলে যেতাম ওদের বাড়িতে। ওকে দেখে চলে আসতাম। কথা হতো না। কথা হতো ও আমাদের বাড়িতে এলে। এভাবেই সাত বছর কেটে গেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি এখন। ইচ্ছা থাকলেও তেমন একটা কাছে পাইনি দুজন দুজনকে। পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকি ছোটবেলা থেকেই।

আমার সব কিছু শেয়ার করতাম ওর সঙ্গে। এমনকি কোন মেয়ে আমাকে চিঠি দিতো, ফুল দিতো, ফোন করতো, সব কিছু। সব সময়ই চাইতাম কোন ফাক না থাকুক আমাদের মধ্যে।

তার মাঝে দেখতাম উল্টোটা। সব সময়ই লুকোচুরির একটা প্রবণতা কাজ করতো ওর মাঝে। অনেক কিছুই লুকিয়ে যেতো। আমি জানতাম। কিন্তু বুঝতে দিতাম না।

১৯৯৮ সালে ঈদের এক সপ্তাহ আগে মাকে হারিয়েছিলাম আর এবার ঈদের তিন মাস আগে ওকে। ও বলতো, আমার সঙ্গে এক বিছানায় কোনো মেয়েকে দেখলেও বিশ্বাস করবে না। ভাববে ভুল দেখেছে। অথচ সেই ও কি অবলীলায় সহজে কিছু চরম মিথ্যাকে সত্যি ভেবে আমাকে আবার একা করে দিয়ে গেল।

না, ঈদ নেই আমাদের মতো ছেলেদের জীবনে। ঈদের কথা মনে হলেই ভাবি, মাকে হারিয়েছি, ওকে হারিয়েছি, এবার কি হারাতে হবে?

ঢাকা থেকে

rudro2004@gmail.com

স্পেশাল

ছোটবেলা থেকেই ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির।

আমার কোনো বোন না থাকাতে পাশের বাসার আপুরা আমাকে বেশ আদর স্নেহ করতেন আর আমিও বড় বোনের মতো ওনাদের দেখতাম।

ঈদে আমাদের মাঝে একটা রেওয়াজ চালু আছে নামাজ পরে এসে বড়দের পা ছুয়ে সালাম করা, বকশিশ নেয়া, কোলাকুলি করা ইত্যাদি। আমি সে নিয়মের ব্যতিক্রম নই।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। রোজার ঈদ। যথানিয়মে নামাজ শেষে গেলাম পাশের বাসায়। উদ্দেশ্য সালাম করে সেলামি নেয়া।

ওনারা হলেন তিন বোন। বড়আপু ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। ওনার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল আর তিনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। এটা-ওটা খেতে দিতেন। ওনাকে যখন সালাম করা শেষ করলাম, তিনি বললেন, শুধু সালামে সেলামি মিলবে না।

আমি তো বোকা হয়ে গেলাম। বললাম, আপু, তাহলে কি করতে হবে, তিনি আশপাশে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কোলাকুলি করতে হবে।

না বুঝে সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। অনেক কিছুই বুঝতাম না। বুঝলাম কোলাকুলির পর।

যখন কোলাকুলি করার জন্য ওনার কাছে গেলাম, তিনি বললেন, পাশের ছোট রুমে যেতে।

ওনার রুমে গেলাম।

তিনি দরজার ওপর থেকে পর্দা নামিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কঠিন এক কোলাকুলি করলেন আমার সঙ্গে। অনেকক্ষণ।

ওনার বুকের ওপরের অংশের ওঠা-নামা, নিঃশ্বাস, উষ্ণতা সবই টের পেলাম। তখন তেমন কিছুই বুঝলাম না।

আসার সময় শুধু বললেন, কাউকে যেন না বলি।

তারপর অনেক সেলামি নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

বাসায় এসে বুঝলাম অনেক কিছু। অন্য রকম এক অনুভূতি টের পেলাম। তারপর আমরা প্রায়ই কোলাকুলি করি। কোনো সেলামি নিই না। তবে উপঢৌকন হিসেবে কোলাকুলির সঙ্গে আরো অন্যান্য অনেক কিছু দেখার এবং স্পর্শের সুযোগ পাই।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি বেশ পাকা হয়ে গেলাম। খেয়াল করলাম আমার লাজুক ভাবটা একদম চলে গেছে। লাইফটাই কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল।

আপুর বিয়ে হয়েছে তিন বছর হলো। এখন আর কোলাকুলির সুযোগ পাই না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মোমেনশাহী, ক্যান্টনমেন্ট থেকে

একা

– মিন্টু

অর্থনৈতিক কারণে ২০০১ সাল থেকেই আমি কুয়েত প্রবাসী।

দুই বছর পর প্রথম ছুটিতে গেলাম ২০০৩ সালের ১৩ রমজানের সময় তিন মাসের ছুটি নিলাম। লক্ষ্য, দুটো ঈদ এক সঙ্গে কাটিয়ে আসা।

আমরা থাকি চট্টগ্রামে। অনেক দিন পর পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চমৎকার ঈদ কাটালাম।

কুমিল্লায় গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম ঈদের চার দিন পর। দুই বছর পর এসেছি। তাও আবার প্রবাস থেকে। যেখানেই যাই, অন্য রকম আদর আপ্যায়ন। বাড়িতে বেশির ভাগ মানুষই দশটা সাড়ে দশটার ভেতর ঘুমিয়ে যায়।

একদিন রাত এগারোটার দিকে উঠোনে হাটছি আর সিগারেট টানছি। হঠাৎ চোখে পড়লো পাশের বাড়ির আলগা ঘরে (যেখানে জ্বালানি বা বিভিন্ন শস্য রাখা হয়) কে যেন বসে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম দূর সম্পর্কের এক চাচার মেয়ে।

সে অনেক ছোট ছিল। হালকা পরিচিত। গত দুদিনে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আমার চেয়ে আট বছরের ছোট। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তিন মাসের মাথায় ডিভোর্স।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এতো রাতে বসে আছিস, ঘুমাসনি যে, কি ব্যাপার?

বললো, ঘুম আসছে না। তাই বসে আছি।

বসলাম চৌকির এক পাশে। কথা বলতে বলতে ভাবছি গ্রামের বাড়ি, কেউ দেখলে কিছু ভাববে না তো। তাছাড়া কিছুটা সংকোচও। আমার প্রেমিকা ছাড়া এভাবে নির্জনে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপচারিতার অভিজ্ঞতা আমার নেই। উঠে যাবো কি না ভাবছি। কিন্তু সে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে প্রবাস জীবন সম্পর্কে। আমিও তাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি। সাবেক স্বামী, শ্বশুরবাড়ি ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে বলতে হঠাৎ সে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো।

কি বিপদ। ভয়ে আমার আত্মারাম খাচাছাড়া।

উঠে গিয়ে বললাম, চুপ কর, এতো রাতে কাদছ। মানুষে শুনলে কি ভাববে। আমি যাচ্ছি বলে পা বাড়াতেই হঠাৎ সে আমার হাত দুটো ধরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো।

হাজার ভোল্টের ইলেকটৃক শক খেলাম। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

সে খুব কাতর চোখে তাকালো।

বললাম, দুঃখিত, এটা কখনোই সম্ভব না।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বুকে মাথা রেখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

এতো দিন শুনেছি মেয়েরা গলে যায়, আজ আমি গলে গেলাম। ভুলে গেলাম আমার ভালোবাসার মানুষটার কথা। প্রাণপ্রিয় মণিকে দেয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম। আমার হাত তার সারা অঙ্গে বিচরণ করতে লাগলো। সে এক অসহ্য ভালো লাগা। দুজনেই অস্থির হয়ে উঠলাম। আধভাঙা চৌকিতেই চললো বস্ত্রহরণ। প্রায় পনেরো মিনিট চললো সাইক্লোন ক্যাটরিনা।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে থমকে দাড়ালাম। মণির মায়াবী মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। এ কি করছি আমি! At the eleventh hour নয়, 11th hour 59 sec–এ এসে থেমে গেলাম।

সে শক্ত করে জাপটে ধরে ফুসতে লাগলো।

নিজেকে মুক্ত করে নিজের ঘরে পা বাড়ালাম। জানি সে আমায় কাপুরুষ ভাবছে। কিন্তু পারিনি মণির ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে আমার কুমারত্ব বিসর্জন দিতে। জানি সেদিন নিজেকে সংবরণ করতে কতোটুকু কষ্ট হয়েছিল।

পরে চট্টগ্রাম গিয়ে জিগরি দোস্ত রাজ্জাকের কাছে সবিস্তারে বললাম। বিশ্বাস করলো কি না জানি না। তবে ধন্যবাদ জানালো। হয়তো মণিও বিশ্বাস করতো না। কিন্তু আমার ভালোবাসা শক্তিশালী ছিল বলেই সেদিন ফিরে আসতে পেরেছিলাম।

সময়ের আবর্তে আমার সেই প্রাণপ্রিয় মণি অন্যের ঘরণি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমরা আজ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন। আমি যথানিয়মে প্রবাসী। অপেক্ষারত, জীবন্মৃত, একা, বড্ড একা।

সাফাত, কুয়েত থেকে

অদেখা ভুবন

– মুনা

সেদিন গিয়েছিলাম *একাডেমি ফিল্ম সোসাইটি*–তে।

আমি মেয়েটা একটু বেশিই রক্ষণশীল, রি–অ্যাকটিভ, ইংরেজি সাহিত্যের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী হয়েও ভালোবাসা, প্রেম ও জীবন যাপনে উদারতার পরিচয় দিতে পারিনি কোনোদিন। মৈত্রেয়ী দেবীর ট্র্যাজেডি বাঙালির হৃদয়, মনকে উদ্বেলিত করলেও তা কখনোই আমাকে ছুয়ে যায়নি, বরং বিয়ে বহির্ভূত নারী–পুরুষের এমন অনৈতিক সম্পর্ক আমার চিত্তকে বহুদিন পর্যন্ত অস্থির করে রেখেছিল।

জীবনের খুব সুন্দর একটা অর্থ আছে আমার কাছে। সেটা হলো সীমা অতিক্রম না করা। আমার কাছে জীবন মানে খুব সাধারণ আটপৌরে জীবন। প্রচুর আলো প্রত্যাশী। শ্বশুর–শাশুড়ি, দেবর–ননদ আর ভালোবাসার ছোট্ট ফুল।

কিন্তু আমার ভালোবাসার মানুষটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। বিজ্ঞানকে জীবনের একমাত্র পাথেয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। তবে সে কখনোই আমার সেন্টিমেন্টকে আঘাত করে না। আমার ভাবালুতাকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। আমার স্বপ্নগুলোর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করে সেগুলোর বাস্তব রূপ দেয়ার।

আমাকে একটু বিষণ্ন দেখে হেসে বলে, আমি কি তোমাকে খারাপ কিছু দেখাতে পারি!

হল ঘরের পাশেই আরেকটি ঘরে বসার বন্দোবস্ত। ঘরটি বেশ পরিপাটি করে গোছানো। প্রতিটি টেবিলের পাশেই চারটি চেয়ার ঘেরা। টেবিলের ওপর ট্রে, তাতে পরিষ্কার কাচের বোতলে দুই বোতল পানি ও ঝকঝকে দুটি গ্লাস। পাশেই ছোট্ট আরেকটি বোতল থেকে ঝুলে থাকা মানিপ্ল্যান্ট ঘরটিকে আরো বেশি আন্তরিক করে তুলেছিল। সব কিছুতেই একটা রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ। বেশ খেয়াল করে দেখতে লাগলাম।

ও টুকটাক গল্প করছিল। ও এই ফিল্ম সোসাইটির একজন সদস্য। সব রেয়ার, একাডেমি পাওয়া মুভিগুলো এখানে দেখানো হয়।

এক সময় সিনেমা শুরু হয়। কোথায় যে হারিয়ে গেলাম! এসব ঘটনা, কাহিনীর বর্ণনা এতো দূরের, অথচ আমার এতো কাছের! হ্যা, হ্যা, আমার আবেগগুলো....! ঠিক আমি! বিশাল সমূদ্রের কূলে। অস্তমিত সূর্যের মুখোমুখি বসে। স্বল্পবসনা যে মেয়েটি কাদছে, আমি তো ঠিক একইভাবে বিরহ যাতনা অনুভব করি। ওই তো আমারই মতো মেয়েটির চোখের কোণে অশ্রু ধারার চটচটে রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। আশ্চর্য! আমার পাশের ছেলেটি সিনেমার ছেলেটার মতো প্রতিদিন কি প্রাণান্ত চেষ্টাই না করে আমার মুখে হাসি দেখার। আচ্ছা, পৃথিবীর সব ছেলেরাই কি প্রিয়জনকে খুশি করতে তাদের পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেয়? আসলে পৃথিবীর সব নরনারীর ভালোবাসার অনুভূতি এক। পৃথিবীর সব নরনারীই ভালোবাসার অনুভূতিতে হয় আবেগপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী, বিরহে হয় ব্যাকুল। ভালোবাসা একইভাবে তাদের হাসায়, কাদায়, উদ্বেল করে তোলে। বিরহী করে তোলে। শুধু তার প্রকাশভঙ্গি হয় ভিন্ন।

ও আমার বুড়ো আঙুল ধরে একটু টান দিল। কি, মন খারাপ?

হ্যা বলে তার সম্পূর্ণ হাতটি অন্ধকারে শক্ত করে আকড়ে ধরে রইলাম।

বিরতিতে কফিতে মুখ ডুবিয়ে চুপচাপ ভাবছিলাম। ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাচ্ছিল আর আমাকে খেয়াল করছিল।

এক সময় সিনেমা শেষ হয়। আমরা রাস্তায় বের হয়ে হাটতে থাকি।

ও বললো, তোমার খুব মন খারাপ করেছে, তাই না? তুমি আসলে ফাস্ট লাইফ দেখনি তো তাই একদমই সহ্য করতে পারো না। আমি বাইরে পড়াশোনা করেছি। আমার একটু–আধটু ধারণা আছে। তাই এতো সহজে মন খারাপ হয় না।

একটু আগেভাগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাতে তার ফোন এলো।

হ্যালো বলতেই বললো, তুমি কেন ভাবো একটা মুভি দেখলেই তুমি খারাপ হয়ে যাবে। তোমার কি ইচ্ছা হয় না তোমার আশপাশের মানুষগুলোকে জানতে, এই দুনিয়া সম্পর্কে জানতে? তুমি তখনই খারাপ হবে যখন ওদের ব্যাপারগুলো অন্ধ অনুকরণ করবে। একজন আত্মমর্যাদাশীল মানুষ কখনো অন্ধ অনুকরণ করে না।

ফোন রেখে মনে মনে বললাম, সিনেমা দেখে আমার মন একটুও খারাপ হয়নি। বরং জীবনের একটি অদেখা রূপ আবিষ্কার করেছি। আমার মায়া লাগছে সবার জন্য। তোমার জন্য, আব্বার জন্য, আম্মার জন্য, ভাইবোনদের জন্য। আরো অনেক ভালোবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে তোমাদের। পৃথিবীতে ধনী–গরিব, শাদা–কালো,

ক্ষমতাসীন–বিরোধী, অনেক প্রকার ভেদাভেদ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে ভালোবাসার মানুষগুলোর অনুভূতির মধ্যে কারো সঙ্গে কারো বিভেদ নেই। এরা সবাই সমান।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

ভেসেকটমি ও জটিলতা

– শামীম হুসাইন

রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে ঘোষপাড়ার মোড়। পথের দূরত্ব কয়েকশ গজ মাত্র। হেটে এই পথ অতিক্রম করতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবুও অনেক সময় রিকশায় চড়তে হয় আর গভীর রাতে একা হলে তো কোনো কথাই নেই। কারণ ঘোষপাড়ায় বেশ কিছু দুর্ধর্ষ কুকুর আছে। এগুলো প্রায়ই মানুষের পিছু নেয়। রাত হলে অনেক সময় তাদের পায়ে কামড় বসিয়ে দিতেও ছাড়ে না।

সে রাতে কাজ করতে করতে টেরই পাইনি কখন ঘণ্টার কাটা ঘড়ির সবগুলো ঘর অতিক্রম করে এসেছে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। প্যান্টের হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটুখানি উষ্ণতা পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে বারান্দায় এসে দাড়ালাম। ভাগ্যক্রমে একটা রিকশাও পাওয়া গেল। ভাড়া না ঠিক করেই সেটাতে চড়ে বসলাম।

পথে যেতে যেতে শুনলাম রিকশাচালকের নাম শাহাদত আলী। হাসপাতালের সীমানা অতিক্রম করে রাস্তায় নেমে আসার পর সে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি একজন ডাক্তার?

জানি না, আমাকে সে এর আগে কোনোদিন হাসপাতালে দেখেছিল কি না? এমনো হতে পারে, প্যান্টের পকেটে ঢোকানোর আগে আমার হাতের স্টেথোস্কোপটা তার নজরে পড়েছিল।

আমি একটা ইতিবাচক জবাব দিলে রিকশার গতি সে অনেকখানি কমিয়ে আনলো।

তাকে তাড়া দিতে দিতে বললাম, একটু জোরে চালাও ভাই। বাসায় আমার অনেক কাজ আছে। কোনো ভূমিকা ছাড়াই এবার সে তার সমস্যার কথা বললো।

আট বছর আগে সে বিয়ে করেছে। পাত্রী তার নিজেরই পছন্দ। অনেক দিনের জানাশোনা সুন্দরী নামের সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে গিয়ে অনেক অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু ভালোবাসার দাম তার কাছে সবচেয়ে বেশি ছিল। পরে অবশ্য শাহাদত আলীর মা–বাবা নিজেদের পুত্রবধূকে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দুটো ছেলেমেয়ের জনক হয়েছে সে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই যুগে বেশি সন্তান তার কাম্য নয়। তাই সুখী একটা ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সে বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মোটামুটি সুখ ও স্বাচ্ছন্দেই কাটছিল তাদের জীবন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকার বোধহয় কারো নেই। ফলে তিল তিল করে গড়ে তোলা তাদের সুন্দর এবং সুখী সংসারেও একদিন ছন্দপতন ঘটে গেল।

প্রায় বছর তিনেক আগে শাহাদত আলী নিজের ভেসেকটমি করিয়েছে। এতো দিন সামান্যতম কোনো অসুবিধা হয়নি। শুধু সে কেন, দেশের কতো পুরুষই তো সুখী একটা সংসার গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের ভেসেকটমি অপারেশন করিয়েছে। তাদের সবাইকে যে অপ্রীতিকর কোনো অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে তা নয়। তবে শাহাদত আলীর ওপর আজ সংসার ভেঙে পড়ার মতো অভিশাপ চেপে বসেছে।

নিজের স্ত্রীকে সে কোনোদিন অবিশ্বাস করেনি। তাছাড়া পিতৃমাতৃহীন সেই মেয়েটার প্রতি তার মমত্ববোধ অসীম। সে জন্য সে স্ত্রীর লাইগেশন না করে নিজে ভেসেকটমি অপারেশনের মুখোমুখি হয়েছে। আজ থেকে সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। এর মধ্যে তাদের সংসারে সচ্ছলতা আরো বেড়েছে। কিন্তু নির্মল সুখের অধিকার যেন কারো নেই। তা না হলে শাহাদত আলীর স্ত্রী আজ পাচ মাসের গর্ভবতী কেন? তবে কি এতো দিন সে যাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে ভালোবেসে এসেছে, যাকে পাশে নিয়ে সে রাতের পর রাত কাটিয়েছে সেই মেয়েটার চরিত্র উত্তম নয়? শাহাদত আলী আরো ভাবতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে সুন্দরীর মিষ্টি

মুখখানা বিভিন্ন ভঙ্গিতে তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। শাহাদত আলী তখন তার নিজের মধ্যে সুন্দরীকে অস্বীকারের মতো প্রয়োজনীয় সাহস বা শক্তি কোনোটাই খুজে পায় না। চোখের সামনেই তো মেয়েটা অন্য দুবারের মতো গর্ভবতী হয়ে উঠছে? তবে কি তার ভেসেকটমি অপরেশন সঠিক হয়নি? তাহলে গত দুই বছর কোনো অসুবিধা দেখা গেল না কেন?

শাহাদত আলী আবার ভাবতে থাকে। হ্যা। তার মা, বাবা এবং প্রতিবেশীদের কথাই ঠিক। সুন্দরী সত্যিই অসতী। তা না হলে এতোদিন পর সে আজ পেটে বাচ্চা ধরবে কেন? কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করা বৌকে বিদায় করে দিতেও তার বিবেকে বেধেছে। তাই সবার কটূক্তি উপেক্ষা করে এতো দিন সে তাকে ধরে রেখেছিল। এভাবে আর কতো দিন? একটা মিথ্যাকে নাকি বার বার করে শুনলে সত্যি বলে মনে হয়। তাছাড়া চোখের সামনেই তো সে স্ত্রীর পরিবর্তন দেখছে। তার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করার মতো বোকা সে এখনো হয়নি।

শাহাদত আলীর কথা শুনতে শুনতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম কিভাবে সোনার একটা সংসারে আগুন ধরতে চলেছে। সাজানো ফুলের বাগানে প্রবেশ করেছে কীট। জানি না এ ধরনের ঘটনায় দেশের অপর কোনো কুলবধূর কপাল পুড়েছে কি না। অথচ এ কথাটা অনেকেরই অজানা, কোনো বিবাহিত পুরুষের ভেসেকটমি করা হলেই যে তার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। কারণ রিফ্যানালাইজেশান প্রক্রিয়ায় ওই পুরুষের ভেসেকটমি আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। তখন স্বাভাবিক কারণেই তার স্ত্রীর গর্ভধারণ সম্ভব হবে। তাছাড়া মেয়েদের এমন কিছু অসুখ আছে যেগুলো গর্ভধারণজনিত উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে। তখন ঝানু স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের জন্যও গর্ভধারণের সঙ্গে সেসব রোগের পার্থক্য নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাড়ায়।

আমি জানি না ভেসেকটমি অপারেশনের পর শাহাদত আলীর মধ্যে রিফেনালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কি না অথবা তার স্ত্রী এমন কোনো অসুখে ভুগছে কি না যা গর্ভধারণজনিত উপসর্গের জন্ম দিয়েছে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, সুখের একটা সংসারে যে আগুন ধরতে চলেছে তা প্রায় নিশ্চিত। সে জন্য শাহাদত আলীকে পরদিন সকালে স্ত্রীসহ হাসপাতালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম।

কিন্তু সে আর আসেনি। তাছাড়া পরদিন থেকে দেশ জুড়ে বিরোধী দলের আহ্বানে লাগাতার হরতাল শুরু হয়েছিল। অবশ্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কিন্তু সব কিছু বন্ধ ভেবে শাহাদত আলীই আসেনি। তার সর্বশেষ সংবাদ জানি না। তবে দৃষ্টি আমার আজো তাকে খুজে ফেরে। আমার কেবলই জানতে ইচ্ছা করে, আমাদের এ সমাজে শাহাদত আলী এবং সুন্দরীদের সর্বশেষ বিধিলিপিটি কি?

রাজশাহী থেকে

কেলি

– তৌফিকা আক্তার নিপু

আমেরিকার শিকাগো থেকে একটা ভলান্টারি প্রোগ্রামে বাংলাদেশে এসেছে কেলি। কেলি–র সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক শেষের মাঝে সময় খুব অল্প দিন।

কিশোরগঞ্জের একটা বেসরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার আব্বা। বেশ কয়েক মাস আগে কিশোরগঞ্জ গেলে আব্বা বললেন, স্কুলে ইংরেজি শেখানোর জন্য একজন বিদেশি মহিলা এসেছেন, সৌজন্যের জন্য তাকে একবার বাসায় আনতে হয়। তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কেলি পরদিন আব্বার স্কুলে এলে ছোট ভাই রাকিবকে পাঠানো হলো তাকে নিয়ে আসার জন্য।

এদিকে বাসার সবাই সামান্য উত্তেজিত।

কেলি বাসায় ঢুকে সরু গলায় বললেন, হ্যালো।

তাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে এলে আব্বা সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সে আবার আমাদের জন্য বিস্কিট নিয়ে এসেছে।

এ সৌজন্য সম্ভবত তাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে শেখানো হয়েছে। এরপর তাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। নানান রকম গল্প জুড়লাম।

তার বয়স তেইশ।

বললাম, আমার তেইশ বছর বয়সে আমি অলরেডি এক বছর বয়সী মেয়ের মা ছিলাম।

সে খুব অবাক হয়ে বললো এটা সে কল্পনাই করতে পারে না।

সেদিন কেলি দুপুরে খেয়ে তারপর গিয়েছিল।

সে আমার নিপু নামকে বলতো নিপিউ।

এরপর একদিন এলো ফটোকপির দোকান কোথায় তা জানতে।

নিয়ে গেলাম তাকে।

আরেকদিন তাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে এলো আমার মেয়ে।

যেদিন আমার এসএসসি ফরম ফিল আপ করার কথা ছিল সেদিন ওকে নিয়ে ব্যাংকে গেলাম। সেখান থেকে মার্কেটে গেলাম এটা–সেটা কেনাকাটার জন্য। কেলি খাদির দোকান থেকে একটা ফতুয়া কিনল।

সেদিন ফেরার পর রিকশা থেকে নামার সময় রিকশাচালক বিদেশি মানুষের অজুহাতে আরো ভাড়া দাবি করছিল।

দারুণ ট্যালেন্টেড মেয়ে কেলি। সেটা বুঝে বলেছিল, তাকে আরো টাকা দিতে হবে কি না।

কেলি একটা হোস্ট ফ্যামিলির সঙ্গে থাকতো। তাকে একদিন বলেছিলাম, সে যে এলাকায় থাকে সেটা তার জন্য নিরাপদ নয়।

সে বলেছিল, ভালো এলাকায় ফ্ল্যাট নিয়ে চলে যাবে। তার সঙ্গে আরো দুই সহকর্মীও থাকবে যারা কিশোরগঞ্জের জন্য দুটি স্কুলে কাজ করছিল।

কেলি বলেছিল, একদিন আমাকে আমেরিকান ফুড রান্না করে খাওয়াবে।

তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাস্তায় তার সমস্যা হয় কি না।

বলেছিল হয়, ছেলেরা তার গায়ে চাপড় দেয়।

তাকে বলেছিলাম, এ ধরনের নোংরা কীট সারা পৃথিবীতেই আছে।

কেলি ভলান্টারি কাজের জন্য বাংলাদেশে এসেছে। সে এসেছে তার বাবা, মা, ভাই, বোনকে ছেড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য।

কেলির সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।

আমি চলে এলে আব্বা ফোনে বলেছিলেন, কেলিরা চলে গেছে।

কেলির সহকর্মী জেসিকা যে এলাকায় থাকতো সেখানকার কিছু নর্দমার কীট জেসিকার গায়ে হাত দিয়েছিল। কেলির ব্যাগ ধরেও নাকি টানাটানি করেছিল। এ সম্পর্কে যুগান্তরে খবরও ছাপা হয়েছিল।

কিশোরগঞ্জ থেকে তারা তাদের প্রোগ্রাম গুটিয়ে নিয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে গুটায়নি।

আব্বার কাছে শুনলাম, কেলি সম্ভবত এখন কুড়িগ্রামে আছে। যদি কুড়িগ্রামের কোনো পাঠকের সঙ্গে কেলির পরিচয় হয়ে থাকে, তাকে আমার কথা বলবেন আর আমার শুভেচ্ছাটুকুও পৌছে দেবেন।

বনানী, ঢাকা থেকে

চমক

– নাজমুল আলম খান রাফী

আজ বাবা অফিসে যাচ্ছেন না বলে মা খুব রাগারাগি করছেন। অথচ বাবা তা গায়েই মাখাচ্ছেন না, শুধু একটু পর পর মুচকি হাসছেন।

বাবার আজকের এই আচরণ দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। যে ব্যক্তি একদিন অফিস কামাই হলে অস্থির হয়ে যান, রাতের ঘুম পর্যন্ত হারাম করে ফেলেন তিনিই কি না আজ অফিসে না গিয়ে অলসভাবে শুয়ে থাকাটাতেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন।

আমারও বাবার প্রতি একটু রাগ হচ্ছিল। অযথা কেন আজ অফিস কামাই দিলেন।

বাবাকে বললাম, কি ব্যাপার বাবা, আজ অফিসে যাচ্ছেন না যে? কোনো কারণ আছে কি?

বাবা যেন এবার একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, কারণ তো একটা আছেই?

কারণটা কি আমাকে বলা যায়?

বাবা আমার কানের কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, আজ আমাদের বিয়ে বার্ষিকী। তাই এবার এদিনটাকে একটু অন্যভাবে পালন করতে চাই।

তাই তো! আজকে সত্যিই একটি বিশেষ দিন। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলবোই না বা কেন? অনেক বছর আগে একবার এদিনটাকে পারিবারিকভাবে মোটামুটি একটা আয়োজন করে পালন করা হয়েছিল। সে রকম তো আর কখনো হয়নি।

আচ্ছা, মায়ের কি মনে আছে আজকের দিনটার কথা, নাকি সংসারের কাজের ঝামেলায় আজকের এই বিশেষ দিনটির কথা ভুলে গেছেন। হয়তো বা মা ভোলেননি। এই বয়সে আর এসব মানায় না ভেবে হয়তো তা কারো কাছে প্রকাশ করেননি।

খোকা একটা কাজ করলে কেমন হয়? হঠাৎ বাবার কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো।

কি কাজ?

আজ তোর মাকে একটা চমক দিলে কেমন হয়। ধর, হঠাৎ তোর মাকে একটা শাড়ি কিনে দিয়ে চমকে দিলাম। কেমন হয় বল তো?

বললাম, মন্দ হয় না বাবা।

তাহলে চল এখনই মার্কেটে যাই। বলেই বাবা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

বাবার এই পরিবর্তনটা এখন আমার খুব ভালো লাগলো। আমারও আর তর সইছে না। খুশি মনে রাজি হয়ে বললাম, চলেন যাই।

হঠাৎ আমাদের বাপ–বেটায় এতো খাতির দেখে মা যেন রহস্যের গন্ধ পেলেন।

মা গম্ভীর ভাবে বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

বাবাও একটু রহস্য করে বললেন, দুই চোখ যেদিকে যায় সেদিকেই যাচ্ছি।

তোমার যেতে ইচ্ছা হলে তুমি যাও। আমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

এবার বাবা একটু অভিমান করে বললেন, ছেলেটা কি শুধু তোমার? আমার কেউ নয়?

মা এবার নীরব।

আমরা দ্রুত বাসা হতে বের হয়ে এলাম মার্কেটে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

মার্কেটে অনেক ঘোরাঘুরির পর বাবা একটা বিরাট শাড়ির দোকানে ঢুকলেন। দোকানটাতে এতো সুন্দর সুন্দর শাড়ি ছিল, আমরা কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ বাবার চোখ পড়লো একটা শাড়ির ওপর। শাদা শাড়ির মধ্যে হালকা কাজ করা হয়েছে। শাড়ির পাড়টাও শাদা। আমার অবশ্য এটা তেমন পছন্দ হলো না। কারণ এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো শাড়ি ওখানে ছিল। কিন্তু বাবার এ শাড়িই পছন্দ হলো এবং বাবা এ শাড়িটাই কিনলেন। শাড়িটার দামও হয়েছিল বেশ। তবু বাবা আপত্তি করেননি। দাম দিয়েই কিনে নিলেন শাড়িটা।

শাড়িটা কেনার পর বাবাকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। আমারও খুব ভালো লাগছিল।

বাবা বললেন, তুই কি কিছু নিবি?

আজ নয়, অন্যদিন নেবো।

বাবা আর কথা না বাড়িয়ে রিকশা খুজতে লাগলেন। পেয়েও গেলাম একটা রিকশা।

খুশি মনে উঠে পড়লাম দুজনে। বাবা আর আমি রিকশায় দুজনে বসে আছি। অথচ কেউ কোনো কথা বলছি না।

এমনই সময় হঠাৎ একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিল আমাদের রিকশাটাকে। দুজন দুদিকে ছিটকে পড়লাম রিকশা থেকে।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের বিছানায়।

আমার জ্ঞান ফিরে দেখি মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাদছেন।

তখনই আমার মনে পড়তে লাগলো, কিভাবে আমরা দুজন দুদিকে রিকশা থেকে ছিটকে পড়লাম।

মাকে বললাম, বাবা কোথায় মা? বাবা কেমন আছেন?

মায়ের কান্নার রোল যেন আরো জোরালো হলো।

ঠিক তখনই আমাদের সামনে ডাক্তার একটা শাড়ি এনে রাখলেন। বললেন, এটি আপনার বাবার হাতে ছিল।

শাড়িটা দেখে মনে হতে লাগলো, বাবা কি শখ করেই না শাড়িটা কিনেছিলেন। এবার আর বুঝতে বাকি রইলো না বাবা কেন মায়ের জন্য শাদা শাড়িটি পছন্দ করেছিলেন।

আচ্ছা, বাবা কি বুঝতে পেরেছিলেন?

বাবা বলেছিলেন, মাকে একটা চমক দেবেন। হঠাৎ বাবার এভাবে চলে যাওয়াটাই কি সেই বিশেষ চমক?

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

সীমা- সীমানা

– ওয়াহেদ হোসেন

সীমা চৌধুরী মরে গেছে। না, এটা স্বাভাবিক মরণ নয়।

চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন মগদা পুলিশ ক্যাম্পে তরুণী সীমা চৌধুরী ও তার প্রেমিক মোহাম্মদ হাফিজকে আটক করা হয় ১৯৯৬ সালের ৮ অক্টোবর। সেখান থেকে সীমাকে রাউজান থানায় দিলে ৯ তারিখ রাতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীমাকে তার রুমে অজ্ঞান ও বিবস্ত্র মতো দেখে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। পত্রিকায় খবর এভাবে আসে যে, রাতে থানার কর্তব্যরত এএসআই উত্তম কুমার মজুমদার, কনস্টেবল মোহাম্মদ সাদেক আলী, আবুল বাশার ও গৌর চন্দ্র কর্মকার দ্বারা সীমা ধর্ষিতা হয়। বিষয়টি জানাজানি এবং জনগণ থানায় চড়াও হলে আসামি হিসেবে ওই চারজনকে সরিয়ে নেয়া হয়।

অক্টেবারের ১৪ তারিখে পুলিশ কর্মকর্তা বাদী হয়ে ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (বিশেষ বিধান) ৬(৩) ধারায় মামলা দায়ের করেন। নিরাপত্তার নামে এরপর চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে রাখলে সেখানে ১৯৯৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশি হেফাজতে সীমা মারা যায়।

মজার বিষয় হলো, ১৯৯৭ সারের ১৩ জুলাই চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিজ্ঞ সিনিয়র বিচারক সৈয়দ এনায়েত উল্লাহ জনাকীর্ণ আদালতে রায় ঘোষণা করেন, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সকল আসামি খালাস।

আইনের ফাকফোকর বলে একটা কথা আছে। এ মামলায় এটি কাজ করেছে, হাম্মা মিয়া এভাবে ভাবছিল তার অত্যাধুনিক কমপিউটারটা সামনে রেখে।

বোকা মিয়ার বাড়িতে পশুপ্রীতি আছে। বোকার মা দশটা মুরগি পোষেন।

বোকা পোষে একটা ছাগল। এ নিয়ে তাকে কেউ কেউ পাগল বলে। ছাগলে-পাগলে নাকি বেজায় মিল।

হাম্মা ও বোকা দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের আরো বন্ধু-বান্ধবী আছে। ১৪ জুলাইয়ের পত্রিকায় সীমা সংক্রান্ত মামলার রায়ে সীমা বা উত্তম গংদের কোনো রকম আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও দুই বন্ধু মামলা বিষয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা খুটিয়ে খুটিয়ে পড়লো। মনে মনে খুব কষ্ট পেল। বিচারককে নিয়ে কোনো কথা বলা চলে না, তাতে আদালত অবমাননা হয়। তবুও তারা রাগ দেখালো বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি। রক্ষা এই যে, প্রেস ক্লাবে ব্যানার টাঙিয়ে নয়, হাম্মাদের বাড়ির আঙিনায় বাগানে বসে ওরা গল্প করছিল।

বিদেশে কুকুর বড্ড প্রিয়। ওরা পোষা কুকুর সঙ্গে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। ছাগলটা সঙ্গে এনেছিল বোকা। কথার মধ্যে বাম হাত দেয়ার মতো করে ছাগলটা বলে উঠলো, ভ্যা অ্যা অ্যা।

ছাগলের কথায় কান দিল না ওরা।

আচ্ছা, আবার তদন্ত করিয়ে মামলা চাঙ্গা করলে কেমন হয়, বললো বোকা।

হাম্মা বললো, সাধারণ মানুষের মন রক্ষা করতে ও সহসা সম্ভাব্য উত্তেজনাকে চাপা দিতে সরকার এমন একটি ভূমিকা নিতে পারে। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি?

বিল গেটসকে জানাই বিষয়টার সুরাহা করা যায় কি না।

বোকা একটু আগে বিষয়টার গভীরে যেতে চেয়েও এখন চেপে যেতে চাইলো। বললো, কি দরকার এসব করে। এতে তোর সময় নষ্ট হবে, খরচপাতিও হবে। অথচ প্রতিদান বা কোনো সুফল তোর ঘরে পৌছাবে না।

হাম্মা একটু ভাবলো। বললো, বিবেক নামের একটা বিষয় আছে যে!

বিবেক! ওসবের গলা টিপে মেরে ফেল। বরং উত্তম-মধ্যম কুমারদের বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে দে। সীমা তো মরেই খালাস।

দেখি, আমার বাইনারি কি বলে। কি বোর্ডে আঙুল ছোয়ালো। প্রশ্ন করলো, সীমা বিষয়ে আমাদের কি কিছু করণীয় আছে?

মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠলো, 'অবশ্যই।'

হাম্মার কমপিউটারে *বিবেক* নামের সফটওয়্যার সন্নিবেশিত আছে। তাই অনেক বিষয়ে বন্ধু বান্ধবের চেয়ে ওর কমপিউটার যার নাম *বাইনারি* রেখেছে সেই যন্ত্র-বন্ধুটির মতামতকেই প্রাধান্য দেয়।

পর্দায় 'অবশ্যই' বার্তা পাবার পর বোকা মিয়া দমে গেল। বললো, যা ভালো বুঝিস কর।

হাম্মা খেপা টাইপের। যখন যা খেয়াল চাপে তখনই তা তড়িঘড়ি করাটা ওর অভ্যাস।

বাংলা ভাষায় সীমার মৃত্যু বিষয়ে যা যা তার ফাইলে রক্ষিত ছিল সেগুলোকে ফিরিয়ে আনলো। তার সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ করলো, ন্যায্য সমাধান চাই। আরো লিখলো, *সম্ভব হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে*। সবশেষে নিউ ইয়র্কে বিল গেটসের ই-মেইলে চালান করে দিল।

ওরা তখনকার মতো ক্ষান্ত দিলেও হাম্মার মাথায় সীমা ও উত্তম-অধম ছাড়া কিছু নেই। এখন ও ঠিক মতো খাবে না, ঘুমুবে না। সীমা ছাড়া অন্য কথার সদুত্তর দেবে না। এখন বাইনারিই তার প্রকৃষ্ট বন্ধু।

১৪ জুলাইয়ের বিকেলে হাম্মার ই-মেইলে দেখা গেল, বাহাত্তর ঘণ্টা সময় লাগবে। আগাম একটা সংবাদ আছে। তা হলো, আবার তদন্ত ও বিচার হবে।

হাম্মার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বিকেলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো। একটা ভালো ঘুম দরকার। আপাতত বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হবে। ঘুমাতে যাবার আগে পেট পুরে খেয়ে নিল।

একাই সিদ্ধান্ত করলো রাতে বন্ধু-বান্ধবীসহ মারদাঙ্গা ছবি দেখবে ভিসিডি-তে। সেখানেই সবাইকে ফোনে জানান দিল।

১৬ জুলাই তারিখের খবরের কাগজে দেখলো সরকার আপিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হাম্মা ভাবলো এটর্নি জেনারেলের সঙ্গে আলাপ করবে সে। বিবেকের দংশন তাকে তা-ই বলছে।

বাইনারির কাছে সাহায্য চাইলো, আমি এটর্নি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পর্দায় ভেসে উঠলো, না, এ মুহূর্তে নয়। বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ পার করে, তারপর।

হাম্মা দমে গেল। তবু তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। বাইনারির অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না।

১৪ জুলাই বিকেলে বিল গেটস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল নিজ মাতৃভাষায়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবলীল ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে সেখানে পৌছায়। অফিসে ভূরি ভূরি চিঠি এলে চিঠির আগা-মাথা না পড়েও অফিস সুপারিনটেনডেন্ট যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মার্কিং করে দেন তেমনি হাম্মার বার্তাটি মিস্টার গেটস সুনির্দিষ্ট মেশিনে দিতে নির্দেশ দেন কি বোর্ডের কি চেপে।

আজ ১৬ জুলাই ১৯৯৭। বেলা এগারোটা। ই-মেইল এসেছে। তার সঙ্গে অনুরোধ, ছয়শ পঞ্চাশ মেগাবাইটের একট ডিস্ক। ষাট মিনিটের মধ্যে যেন কমপিউটারে মধ্যে স্থাপন করা হয়।

বাইনারির পাশে পাশেই ছিল হাম্মা, বলতে গেলে সব সময়। ও তড়িঘড়ি বায়তুল মোকাররমে ইন্টেলভাইয়ের দোকানে গেল।

কি খবর হাম্মা? বেশ কিছুদিন পর দেখছি।

জি, খবর ভালো। জব্বর। তবে এখন কোনো কথা নয়। আমাকে দয়া করে হাই ফ্রিকোয়েন্সির পাচশ বারো মেগাবাইটসের একটা টেপ কারট্রিজ দিন।

ইন্টেলভাই চোখ বড় করে ফেললেন। বললেন, এটা দিয়ে তুই কি করবি? এটা তো সবাই ব্যবহার করে না।

কথা বাড়াবেন না। দিলে দিন।

আচ্ছা, আচ্ছা। ইন্টেলভাইও জানেন হাম্মার মেজাজের বহর।

হাম্মা বেবিট্যাকসিতে চেপে বাসায় ফিরলো। বাইনারিতে লোড করলো ডিস্কটি। খেয়ে নিল একগাদা খাবার। পরোটা, মাংস, ফল ও ম্যাংগো জুস।

বোকাকে টেলিফোন করলো হাম্মা। বন্ধুদের মধ্যে ওর বাসা সবচেয়ে কাছে। তাছাড়া হাম্মার বেশির ভাগ কথাতেই ও সায় দেয়। বেহুদা তর্ক করে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওকেই পছন্দ। আরেকজনের কথা ভাবছিল। টমাটো বেগম। মেয়েমানুষ না হলে ওকেও এখন ডাকতো। টমাটোর মাথাটা বেশ পরিষ্কার। তবে এমন একটা জটিল সময়ে প্রেমিকাকে কাছে না রাখাই ভালো, একাই বললো, অনুক্ত।

পর্দায় ভাসছে। পেন্টিয়াম II।

১৯৯৭ এডি। ১৬ জুলাই। ওয়ান পিএম। মিস্টার হাম্মা, লেখো, চট্টগ্রাম জেলা। রাউজান থানা। রাউজান থানার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ লেখো। ওকে। থানার স্থানটায় একটা ডট দেখতে পাচ্ছ। ওটাকে গোল করে নাও। পিকচার ভার্শন চালু করো। পুরো থানা এলাকা দেখতে পাচ্ছ। আগের ডট মুছে দাও। এবারে ফুল স্টপ বাটন টেপ। ওইটাই নির্দিষ্ট রুম। আবার লেখো, ১৯৯৬ এডি। ৯ অক্টোবর। সারা রাত। এখন ভয়েস চার্ট ও ভিডিও কনফারেন্সিং দেখো।

ওরা নিজ চোখে বেশ কিছু দৃশ্য দেখলো। হাম্মা ও বোকা নিশ্চুপ। ওদের ঘরের দরজা ভালো করে সেটে দেয়া। মাঝে মধ্যে ওরা নিজেদের মুখমণ্ডল বিকৃত করছে। দীর্ঘশ্বাস আসছে আপনা- আপনি। ডিস্কে ওই রাতে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রুমের সংঘটিত সব কিছুই সিনেমার পর্দায় ধারণ করার মতো করে উৎকলিত হলো। সময় লাগলো এক ঘণ্টা।

মনিটরে আবার ভাসলো, লেখো, চট্টগ্রাম জেলা। চট্টগ্রাম জেলা কারাগার। লালদীঘি। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ লেখো। তিন বর্গকিলোমিটার স্থানকে গোল করে নাও। লেখো, ১৯৯৭ এডি। ৭ ফেব্রুয়ারি। লেখো, ৭ ফেব্রুয়ারির আগের চার দিন। আবার লেখো ৭ ফেব্রুয়ারির পরের চার দিন। লেখো, ধর্ষিতা সীমার রুমো। ও.কে। এখন দেখতে থাকো।

হাম্মার মাল্টিমিডিয়া কমপিউটারে মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা সংযুক্ত। জেলখানায় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭-এর পূর্বাপর মোট নয় দিনের কেচ্ছাকাহিনী ধারণ করা হয়ে গেল ডিস্কে। বিচিত্র ঘটনার ছবি ওরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখলো। কিন্তু বীভৎস চিত্র দেখে ওদের দেহ-মন ঘৃণায় রি রি করে উঠলো।

মনটা দুজনেরই খারাপ। এমন বিষয়কে মানুষ কিভাবে চাপা দিতে পারে, ভাবলো ওরা।

যাহোক, পুনর্বিচারে এবার বিচারকই দেখতে পাবেন প্রকৃত ঘটনা।

ডিস্কটার আরেকটা কপি করে রাখো। এবারে তোমাদের এটর্নি জেনারেলের কাছে যাও এবং তাকে বলো, পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অন্যায় করে বাচা সত্যিই কষ্টকর। সীমাকে আমরা হয়তো ফেরাতে পারবো না। তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবশ্যই অপরাধীকে দিতে হবে। পৃথিবীর সুখের বাসরের জন্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এটর্নিকে বলো, ঘটনার মৃত্যু নেই। তা হোক সে অতীত বা ভবিষ্যৎ। ধন্যবাদ মিস্টার হাম্মা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করার জন্য। আবার দেখা হবে। বন্ধু বিদায়।

একটা দীর্ঘতম নিঃশ্বাস এক সঙ্গে বেরুলো ওদের দুজনের শ্বাসনালী থেকে। বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ থাকলো। পরিবেশকে অন্য জগতে নিতে সচেষ্ট হলো বোকা।

চল। টমাটোকে নিয়ে একটা চায়নিজে ঢু দিই। বললো বোকা।

হাম্মা লুফে নিল কথাটা। বললো, অবশ্যই। আজ চায়নিজে বসে তোদের সামনেই টমাটোর গালে চুমু খাবো। মাইণ্ড করিস না যেন।

ঢাকা থেকে

জেখানায়

– মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া মনজু

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বছর ১৯৭২। যুদ্ধজয়ী বিধ্বস্ত দেশের ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সরকার। বিধ্বস্ত দেশের সর্বত্র দেশ পুনর্গঠনের কাজ চলছে একদিকে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে মুখ চেনা কিছু যুবকের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে বড় বড় খাদ্য গুদামে লুটপাট চলছে। বলতে গেলে নবগঠিত ক্ষমতাসীন সরকার এদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। সাবেক মুক্তিযোদ্ধা এই আমি কিছুদিন হলো রেডিও বাংলাদেশে যোগ দিয়েছি। থাকতাম আগারগাওয়ের এক মেসে।

নতুন চাকরি বলে বাড়িতে তেমন যাওয়া হয় না। তবে বাড়ির খবরাখবর ঢাকায় বসেও পেতাম। বাড়িতে যাওয়ার জন্য বৃদ্ধ মা খবর পাঠিয়েছেন। এবার না গেলে রক্ষা নেই।

দেখতে দেখতে রমজান মাস এসে গেল।

পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে ঈদ করবো বলে রওনা দিলাম। আমার গ্রামের বাড়ি আবার ফেনী জেলায়। তখনকার দিনে ঢাকা থেকে ফেনী আসার সরাসরি বাস ছিল না। এ যাত্রা পথে তখন ছিল মেঘনা ও দাউদকান্দিতে দুটো ফেরি। তাই ঢাকা থেকে একটা বাসে আসতে হতো দাউদকান্দি। সেখানে বাস পাল্টিয়ে উঠতে হতো চট্টগ্রামের বাসে।

যাত্রাপথে মোটামুটি ঝুট ঝামেলা কাটিয়ে দাউদকান্দি ফেরিতে চড়লাম। ফেরিঘাটে ভিড়তেই দেখলাম জটলা। জনাবিশেক পুলিশ দূরপাল্লার বাসে তল্লাশি করে কিছু দুর্বৃত্তকে খুজছে। কারণ এ ফেরিঘাটে কিছুদিন আগে তৎকালীন সারা দেশে নামকরা যাত্রাপালা দলের সুন্দরী নর্তকী বিউটিকে কিছু দুর্বৃত্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল।

সে দুর্বৃত্ত দলের সন্দেহভাজন একজন বলে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। কিছু বুঝে ওঠার সময় না দিয়ে আমাকে হাত পিছমোড়া করে বেধে নিয়ে যাওয়া হলো দাউদকান্দি থানায়।

খবর দিতে পারলাম না বাড়িতে। কিভাবে দেবো, কে কাকে চিনবে? তবে থানায় আমার চাকরির কথা বললাম, অফিসে খবর পাঠাতে ডিউটি অফিসারকে অনুনয় করলাম।

কোনো কাজ হলো না। ততোদিনে অফিসে অফিসে সরকারি ছুটি শুরু হয়ে গেছে।

ঈদুল ফিতরও পেরিয়ে গেল। আমার চাকরির প্রমাণে যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে একজন অফিস পিওনকে দাউদকান্দি থানায় পাঠানো হলো। প্রমাণিত হলো আমি চাকরিজীবী, দুর্বৃত্ত নই। ফাকতালে আমার ঈদের আনন্দ থানায় শেষ হলো। ছাড়া পেলাম থানা থেকে এবং বাড়িতে পৌছালাম ঈদুল ফিতরের আট দিন পর।

আজও মনে আছে, বাড়ি আসার খবর শুনে আমার গ্রামের সবাই এসেছিল আমাকে দেখতে। সেদিন মা বলেছিলেন, বাবা, আগামী ঈদ বাড়িতে কাটাবে।

মায়ের কথা মতো পরের বছর গ্রামে ঈদ করেছিলাম। কিন্তু আমার মা ছিলেন তখন পরজনমে।

আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে বাড়িতেই আছি। ঈদ আসে, ঈদ যায়। নিজের ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে ঈদ কাটাই। সবার মাঝে মা-ই থাকেন অনুপস্থিত।

ফেনী থেকে

স্মৃতি

– বিলকিস বারী লিপি

আগের কথা।

তখন ঈদ ছিল অনেক বৈচিত্রময়, অনেক সুন্দর। ঈদের কিছু দিন আগে আমাদের জন্য ঈদের জামার কাপড় কেনা হতো। জিজ্ঞাসা করা হতো কোন ফুলের কাপড় চাও? বড় ফুল ছাপা না ছোট ফুলের ছাপা। শুধু শোনামাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের পছন্দের ফুলের কথা বলে দিতাম। অন্য কিছুর স্বাধীনতা ছিল না। আনা হতো কাপড়, বানানো হতো জামা এবং সেই জামা এখনকার মতো দর্জি দিয়ে বানানো হতো না, হতো নিজেদের মেশিনে। কি যে আনন্দ হতো বলে বোঝাতে পারবো না। অনেক সময় দেখা যেতো, ঈদের আগের দিন কাপড় কেনার দরুন রাতভর কাপড় সেলানো হচ্ছে। আমরা ভাইবোন কি যে উচ্ছ্বাস নিয়ে সেই মেশিনের চারপাশে অধীর আগ্রহে কাপড় সেলানো দেখছি এবং দেখছি। সেই সঙ্গে ভাবছি কখন সেলানো হবে এবং কখন সেই কাপড় পড়ে ঈদের সারাবেলা ঘুরে বেড়াবো পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি।

ঈদের দিনের সেলামি দিয়ে কি কি কিনবো তা নিয়েও ভাবতে বসতাম ঈদের আগের দিন। যদি সৌভাগ্যক্রমে জামা ঈদের দুদিন আগেই সেলানো হতো তবে তো মনে হতো নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান। কি, আপনাদের কি খুব অবাক লাগছে কথাটি শুনে? অবশ্য তার একটা জোরালো কারণ আছে। সেটি হলো, জামাটি আগে পাওয়ায় একটু ট্রায়াল দিতাম দরজা, জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে। দেখতাম আর ভাবতাম ঈদের দিনে কেমন দেখতে হবে আমাকে? মনে মনে শুধু অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম কখন সকাল হবে, কখন মায়ের হাতের পায়েস, সেমাই খেয়ে বের হবো বেড়াতে।

এখন জীবনের এই প্রান্তে এসে ঈদের দিনের সেই আনন্দের রেশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই সঙ্গে চোখের দুকোণ বেয়ে অঝোর ধারা ঝরে। কেবলই মনে হতে থাকে, কোথায় মায়ের সেই হাতে ঘুরিয়ে মেশিন চালানো, চারধারে ভিড় করা ভাইবোনদের বসে অপেক্ষার প্রহর গোনা, কখন তৈরি হওয়া সেই জামা পরে চুপি চুপি ট্রায়াল দেয়া।

হায়রে! এখন দেখি ঈদে কোন অনুষ্ঠান হবে, কি হবে না, ইত্যাদি।

উত্তরা থেকে

দিল্লির লাড্ডু

– মোহাম্মদ ফজলে এলাহী চৌধুরী

১৯৯৪ সালে এমকম পাস করে চাকরিতে যোগদান করলাম। প্রথম দুই বছর বেশ ভালোই কাটলো, জীবনটাকে বেশ উপভোগ করছি। প্রজাপতির মতো রঙিন ডানা মেলে শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছি। মাঝে মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন ফুল কাছে আসে তার সৌরভে আমাকে সুবাসিত করার জন্য। কখনো থমকে দাড়িয়ে সুবাস নিয়েছি আবার কখনো ইশারায় বুঝিয়েছি সুবাসের মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছি।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুই বছর। এ দুই বছর পরেই শুরু হলো মায়ের চেচামিচি। যখনই বাড়ির সবাই এক সঙ্গে হতো তখনই মা তার চেচামিচিটা একটু বাড়িয়ে দিতেন। কেননা সব মা-ই তো চায় তার সন্তান থাকুক দুধে-ভাতে অর্থাৎ সুখে।

মা মাঝে মধ্যে বড় ভাইবোনকে ডেকে বলতো ওর বয়স হয়ে যাচ্ছে, দেখেশুনে যতো দ্রুত সম্ভব বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে।

সবচেয়ে অসুবিধা হতো রাতে যখন সবাই মিলে এক সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসতাম তখনই বিয়ের কথার ঝড় উঠতো।

এভাবে সময় যায়, দিন যায়। দেখতে দেখতে আরো প্রায় দুই বছর পার হয়ে যাচ্ছে। একদিন মা প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে একদিন আমাকে তার বেড রুমে নিয়ে দরজা বন্ধ করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোনো পছন্দের মেয়ে আছে? আমাকে নাম ঠিকানা দাও আমি মেয়েকে নিয়ে আসি।

মাকে তখন মজা করে বললাম, মা, এই কথাটি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বলতে তাহলে এতো দিনে চারটি বিবি থাকতো।

আমার কথা শুনে মা হেসে ফেলে চেচিয়ে উঠলেন, একটাই খুজে বের করতে পারছিস না, আবার চারটা!

এরই মধ্যে আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিতজন চার পাচটি মেয়ের জীবন-বৃত্তান্ত দিলেও কোনোটা পছন্দ হলো না। একটি মেয়ের জীবন-বৃত্তান্ত মায়ের হাতে তুলে দিলাম।

মা দিনক্ষণ ঠিক করে সেই মেয়েকেই ১৯৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ছেলের বৌ করে নিয়ে এলেন।

আমার যখন বিয়ে হয় তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকি।

বিয়ের দুই বছর পর মায়ের ইচ্ছায় ভিন্নভাবে বসবাস করতে শুরু করি। প্রথম যেদিন নিজের ভাড়া করা বাসায় উঠলাম তার পরদিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। সকালে গিয়ে স্ত্রীর লিস্ট অনুযায়ী বাজার করে নিয়ে এলাম।

তারপর আমি ও আমার স্ত্রী দুজনে মিলে এক সঙ্গে রান্না শেষ করে গোসল করে টেবিলে বসলাম দুপুরের খাওয়া শেষ করার জন্য। টেবিলে বসে ঠিক করলাম, আমার রান্নার ওপর স্ত্রী নাম্বার দেবে আর স্ত্রীর রান্নার ওপর আমি নাম্বার দেবো। তবে কাজটি করবো খুব অনেস্টলি।

এই কথা, সেই কথা বলতে বলতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে। ঠিক তখনই উপলব্ধি করলাম এতো কিছু রান্না করা হলো, কিন্তু ভাতই রান্না করা হয়নি।

সেই মুহূর্তে স্ত্রী এতোটাই লজ্জা পেল যে তার চোখ ছল ছল হয়ে উঠলো।

সান্ত্বনার সুরে বললাম, দেখো, তুমি যতোটা লজ্জা পাচ্ছো তার অর্ধেকটা আমার। কেননা আজকের রান্নার প্রক্রিয়ায় আমারও যে কিছুটা ভূমিকা ছিল।

এ কথা শেষ হতে না হতেই স্ত্রী দৌড়ে রান্না ঘরে গিয়ে চেচিয়ে বললো, এই শোনো, টেবিলের ওপর রান্না করা যা আছে, তুমি খেতে খেতে নাম্বার দিতে থাকো, এরই মধ্যে আমি রাইস কুকারে ভাত রান্না করে নিয়ে আসি।

পাঠক, সেই দিনের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, ভালো লাগার সময়গুলো মানব মানবীর জন্য পরম সম্পদ। কেননা নিজে ভালো থাকতে হলে এবং পাশাপাশি অন্যকে ভালো রাখতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও স্যাকৃফাইসের কোনো বিকল্প নেই।

কিছু দিন আগে স্ত্রীর সঙ্গে মজা করতে গিয়ে মহা এক বিপদে পড়েছি। স্ত্রী আমার এতোটাই ক্ষেপেছে, আজও তার মাশুল দিতে হচ্ছে আমাকে। কেননা মাঝে মধ্যে সে এখনো সেই কথার উদাহরণ টেনে নিয়ে আসে। যে কথাটি বলে বিপদে পড়েছি সেটি হলো একটি কৌতুক।

এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বলেছেন, *আমি যদি চার টাকা রোজগার করি তাহলে এক টাকা দিয়ে কর্জ শোধ করি, এক টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি, এক টাকা নিজের জন্য খরচ করি আর বাকি এক টাকা পানিতে ফেলি।*

স্ত্রী জানতে চাইলেন, এর মানেটা কি?

তখন স্বামী ভদ্রলোক একটু বুঝিয়ে বললেন, *এক টাকা দিয়ে কর্জ শোধ করি অর্থাৎ মা, বাবার জন্য খরচ করি। কেননা ওনারা ছোটকালে আমাকে লালন পালন করেছেন।*

এক টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি অর্থাৎ ছেলেমেয়ের জন্য খরচ করি।

এক টাকা নিজের জন্য খরচ করি অর্থাৎ নিজের খাওয়া-দাওয়া, কাপড় ইত্যাদির জন্য খরচ করি।

আর বাকি এক টাকা পানিতে ফেলি অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য খরচ করি।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

নিশি কন্যা

– পলাশ রহমান

গভীর রাত। চার পাশে শুনশান নীরবতা। অন্ধকারগুলো কুণ্ডলি করছে পাহাড়ের কোল ঘেষে। জোনাকির মতো এক ঝাক নিয়ন আলোর মাতামাতিতে আমি বড্ড একা। জানালার কপাট খুলে আকাশের বুকে চোখ রাখি। এক ঘণ্টা বাকা চাদ খুজি। বিশালদেহী পাহাড়গুলোর জন্য আকাশের অনেকটা অংশ দেখতে পাই না। মনে হয় পাহাড়গুলো সরালেই বেরিয়ে আসবে চাদ। বুকের গভীরে অভিমান জমা হয়। মনের অজান্তেই কাগজ কলম নিয়ে বসি। ভূমিষ্ঠ হয় একটা শিশু কবিতা। নাম রাখি রাতের লজ্জা। ঘুম ভেঙে দেখি ভাবীর হাতে কফির পেয়ালা। ঠোটে ঝুলছে দুষ্টু হাসি।

নাশতার টেবিলে ভাবি জানতে চাইলেন, নিশিটা কে?

বুঝতে কষ্ট হলো না সাতসকালে নিশির আবিষ্কার। বললাম, নিশি! নিশি মানে রাত আর রাতের প্রেমে পড়েনি এমন ছন্নছাড়া কবির জন্য তোমাদের এই শহর নয়। যতো দূর চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড় যেন শহর রক্ষার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে দাড়িয়ে আছে নির্ঘুম পাহাড়ের ভাজে ভাজে আপেল আঙুর ক্ষেত। থোকায় থোকায় দুলছে রস টসটস।

ভাবী বললেন, হয়েছে হয়েছে, রাতের ঘোর এখনো কাটেনি দেখছি, আর একটা কফি নাও।

বললাম, তাই দাও। কবিতায় নিশির প্রভাব ভাবীর মনে যে কৌতূহল জন্ম দিয়েছিল তা দমাতে পারার আত্মতৃপ্তি নিয়ে কফিতে ঠোট ছোয়ালাম। ঠিক তখনই মুঠোফোনটা বেজে উঠলো। ভাবীকে রিসিভ করতে বলে ব্যালকনির দিকে পা বাড়ালাম। বললাম, বেশি জরুরি না হলে বলে দিও ঘুমাচ্ছি।

ব্যালকনিতে পৌছানোর আগেই ভাবী হেকে উঠলেন, নিশির ফোন।

হঠাৎ কোনো কথা খুজে পেলাম না। বোকা মার্কা একটা হাসি দিয়ে পালিয়ে গেলাম। ভাবীর খোচা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুজতে লাগলাম। পথের সন্ধানে পথ হারিয়ে তন্ময় তাকিয়ে আছি পাহাড়ের গায়ে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো গুন গুন *নিশি রাত বাকা চাদ আকাশে, চুপি চুপি ...*।

ঝনঝন করে উঠলো ভাবীর কণ্ঠ, কই গো কবি, নিশি রাত কোথায় পেলে। এখন যে বেলা আমার তালু ছুই ছুই করছে।

বললাম, কবির চোখে দেখো হে অর্বাচীন। তুমিও দিনের আলোয় রাতের সন্ধান পাবে।

ভাবীর চোখে মুখে প্লাবন দেখলাম। আবিষ্কারের সুখ প্লাবন। নিশিকে আবিষ্কারের সুখে থই থই দশা তার। কবি প্রেমে পড়েছে। এ যেন বিশ্ব বিরল এক মস্ত বিস্ময়।

ভাবীকে কথা দিলাম নিশির গল্প বলবো। আড়ালে ফন্দি করলাম পালাতে হবে। ছুটি ফুরানোর অজুহাতে পালিয়ে যাবো পাহাড়ের দেশ ছেড়ে।

ইটালি থেকে

palashrahman@libero.it

হোভ লেইন

– হোসেন তৌহিদ জুয়েল

অল্প কিছুদিন হলো অস্টিন ছেড়ে ডালাসে মুভ করেছি। ডালাস বিশাল বড় শহর। আমেরিকার সবচেয়ে বড় দশটি শহরের মধ্যে ডালাস একটি। ডালাসের সঙ্গে লাগা শহরগুলোকে যদি গণনায় আনা হয় যেমন, ফোর্টওয়ার্থ, গারল্যান্ড, মাসকিট ইত্যাদি, সেটিকে যদি বৃহত্তর ডালাস বলা হয়ে থাকে তাহলে এটি হবে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর। এমন একটি জায়গায় এসে আমার *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি* অবস্থা।

প্রতিদিনই রাস্তায় বের হলে একগাদা জ্যাম। যেমন বড় শহর তেমন বড় যেন তার জ্যাম। তারপর আবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাওয়া মানে হাইওয়েতে উঠে মাইলের পর মাইল ড্রাইভ। সেটা যদি নির্বিঘ্নে করা যেতো তাহলে তো ভালোই হতো। কিন্তু বিধাতা বাম। কোথা থেকে যে এতো গাড়ি এসে জড়ো হয় ডালাস শহরে কে জানে! অফিস শুরু আর ছুটির সময় তো বটেই, বেশির ভাগ সময়ই সব কয়টি হাইওয়েতেই হাজার হাজার গাড়িতে ট্রাফিক স্লো হয়ে পড়ে। অথচ তখনই হোভ লেইনের দিকে তাকালে দেখা যায় কিছু গাড়িকে যাদের হাইওয়ের বা ফৃওয়ের টিপিকাল ট্রাফিককে মোকাবেলা করতে হয় না। একেবারে শো করে তারা ছোটে স্পিড লিমিটের সর্বোচ্চ সীমাতে। তখন সেসব গাড়ির দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ হয়ে মনে মনে ভাবি, ইশ, যদি হোভ লেইন দিয়ে গাড়ি চালাতে পারতাম।

হোভ লেইন আসলে কি সেটি অবশ্য প্রথমে বলা দরকার। আমেরিকার খুব সম্ভবত বড় সব শহরে এটি আছে। সেখানে হাইওয়ে বা ফৃওয়ের সবচেয়ে কর্নারের একটি লেইনকে *হোভ লেইন* হিসেবে ধরা হয়। সেখানে রাস্তায় হোভ লেইনের জন্য বিশেষ চিহ্নও থাকে। তবে সেখানে যে কেউ তার গাড়ি নিয়ে উঠতে পারবে না। সেখানে উঠতে হলে গাড়িতে কমপক্ষে দুজন বা বেশি যাত্রী থাকতে হবে। তা না হলে পুলিশ বড় অংকের জরিমানা করে বসবে। আমেরিকাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি গাড়িতে তার একজন প্যাসেঞ্জার। এখানে সবাই যে যার নিজের গাড়ি চালিয়ে অফিসে যায়, অফিস থেকে ফেরে। তাই খুব কম গাড়িই দেখা যায় যেখানে আছে একাধিক প্যাসেঞ্জার। তাদের জন্যই হলো হোভ লেইন (হোভ শব্দটি ইংরেজি হাই অকুপেন্সি ভেহিকল, High Occupancy Vehicle বা HOV থেকে নেয়া)। তবে আসল উচ্চারণ হোভ, না হুভ সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। বেশির ভাগ নতুন ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণে আমি খুবই কাচা।

প্রতিদিনই হাইওয়েতে উঠে যখন অসংখ্য গাড়ির ভিড়ের মাঝে পড়ে গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করি তখনই আফসোস হয় আর মনে মনে ভাবি, ইশ, গাড়িতে যদি আরেকজন প্যাসেঞ্জার থাকতো, তাহলে কি আরাম করেই না হোভ লেইন ব্যবহার করে ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে পারতাম! কিন্তু কি আর করা! শহরের বেশির ভাগ গাড়িচালকদের মতো আমিও গাড়িতে একা। তাই হঠাৎ জ্যামের মধ্যে আটকা পড়লে বিরক্ত হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে আফসোস করা ছাড়া তেমন কিছু করার অবকাশ থাকে

না। এখানে সবারই গাড়ি আছে। কাউকে যে বলবো, ভাই, আপনার রাইড লাগবে? আপনি গাড়িতে উঠলে আমরা দুজন মিলে হোভ লেইন ব্যবহার করে খুব দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌছে যেতে পারবো, সে কথা বলার সুযোগ নেই।

একদিন সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে দ্রুত ছুটছি। গন্তব্যস্থল নোকিয়া থিয়েটার। সেখানে ওজি ওসবর্নের ওজ ফেস্ট কনসার্ট হচ্ছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সারা দিন ধরে কনসার্ট চলছে। সব ভালো ব্যান্ড সন্ধ্যা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বাজানো শুরু করার কথা।

দ্রুত গাড়ি নিয়ে ছুটতে লাগলাম। এখনো গন্তব্যস্থল থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে আছি। ট্রাফিক নরমাল থাকলে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌছানো যাবে। তবে মাঝে কোনো ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে গেলে সর্বনাশ! প্রায় এক ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

কথায় আছে, *যেখানে বাঘের ভয়, বিপদ সেখানে হয়*। আমার বেলাতেও সেই একই কাণ্ড ঘটলো। কিছুদূর আগাতেই গিয়ে আটকা পড়লাম এক ট্রাফিক জ্যামে। দেখাই যাচ্ছে বিশাল জ্যাম। এখান থেকে বের হতে আমার ঘণ্টা খানেকের বেশি লেগে যেতে পারে। আমার তো মাথার চুল একেবারে ছেড়ার মতো অবস্থা।

হঠাৎ রাস্তার একদম কর্নারের দিকে তাকাতেই দেখলাম হোভ লেইন সম্পূর্ণ খালি। সেখান দিয়ে দিব্যি দুই একটি গাড়ি আরাম করে ছুটে চলছে। সেদিকে তাকাতেই আবারও আফসোস করতে লাগলাম, ইশ, গাড়িতে যদি আরেকজন থাকতো তাহলে কতো শান্তিমতো ভাবে হোভ লেইন দিয়ে ছুটে যেতে পারতাম।

আজ আমার সঙ্গে আমার বন্ধু মিলনের যাওয়ার কথা ছিল। তার জন্য একটি টিকেটও কিনে রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে এলো না। তার বৌ তাকে নাকি মানা করেছে। এ ব্যাপারটি ইদানীং প্রায় লক্ষ্য করি। সিঙ্গল ছেলেদের এসব ছেলের বন্ধুর স্ত্রীরা কেন যে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

ট্রাফিক জ্যামে বসে আফসোস করতে লাগলাম আর এদিকে সময়ও যেন দ্রুত পার হতে লাগলো। এমন সময় আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি চলে এলো। সেটি এলো রাস্তার কর্নারে নিশিকন্যাদের হাটতে দেখে। দেরি না করে দ্রুত গাড়ি এক কর্নারে কোনো রকমে চাপিয়ে দিয়ে এক নিশিকন্যাকে বললাম, হাই, গেট ইনসাইড।

নিশিকন্যাও দেরি না চট করে গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি সাইডের দিকে চাপিয়ে হোভ লেইনের দিকে মুভ করা শুরু করলাম। মনে মনে খুশি হয়ে বললাম, এবার আমাকে আর আটকায় কে? ঝড়ের গতিতে হোভ লেইন দিয়ে অল্প সময়েই গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবো।

যেই হোভ লেইনে গাড়ি এনে টান দিলাম, এমনি আমার পাশে বসে থাকা নিশিকন্যা বললো, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? এ ব্লো জব অর ফুল সেক্স? ফর এ ব্লো জব ইটস গনা বি হান্ড্রেড ডলার, অ্যান্ড ফর ফুল সেক্স ইটস গনা বি থৃ হান্ডেড ডলার।

অমনি যেন আমার মাথায় বাজ পড়লো। বিনীতভাবে বললন, দেখো, তোমাকে গাড়িতে ওঠানোর পেছনে আমার কারণটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার এখন একটা কনসার্টে যাওয়ার কথা। রাস্তায় যে বাজে ট্রাফিক জ্যাম ছিল, সেটা থেকে বাচার জন্য আমার হোভ লেইনটা ব্যবহার করার খুবই জরুরি দরকার ছিল। তুমি তো জানোই, হোভ লেইনে গাড়ি নিতে হলে গাড়িতে কমপক্ষে দুজন লোকের প্রয়োজন। এ জন্যই তোমাকে গাড়িতে তুলেছি।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললো, হোয়াট দি ফাক?

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, না না, তুমি চিন্তা করো না। তোমাকে ফিফটি ডলার পে করবো আমার সঙ্গে আসার জন্য। নিশ্চয় এটা অনেক টাকা তোমার জন্য – ফর নো সার্ভিস, তাই না?

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় দফায় হুংকার দিল, ফিফটি ডলার? আর ইউ ক্রেইজি? তোমার সঙ্গে ওখানে গিয়ে আমি কিভাবে ফিরবো? বাসে করে? বাসে ফিরতে আমার দুই ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। সো, তোমার সঙ্গে যেতে আমার আধা ঘণ্টা আর বাস করে ফিরতে আমার দুই ঘণ্টা। সব মিলিয়ে আমার আড়াই

ঘণ্টা সময় নষ্ট হবে। এ আড়াই ঘণ্টায় আমি পাচ পাচটা ব্লো জব দিতে পরি। এবং প্রতিটা ব্লো জব থেকে একশ ডলার হলে চিন্তা করে দেখো, এ সময়টাতে পাচশ ডলার ইনকাম করতে পারি। তুমি কি না আমাকে মাত্র ফিফটি ডলার অফার করছো? গাড়ি থামাও। লেট মি গেট আউট অফ ইওর কার, ইউ মাদা ... ফাকা ...।

বললাম, আচ্ছা আচ্ছা। তোমাকে আমি একশ ডলার দেবো। প্লিজ, আমার সঙ্গে চলো। এখন এই বাজে ট্র্যাফিক জামে আটকা পড়লে কনসার্টের একটা বড় অংশ মিস করবো।

মেয়েটি বললো, কার কনসার্ট?

ওজফেস্ট, ওজি ওজবর্ন, ব্ল্যাক সাবাথ, ভেলভেট রিভলভার, আরো কিছু ব্যান্ড আছে।

মেয়েটি চোখ বড় করে বললো, ওয়াও! হোলি শিট! তাই নাকি?

একটু হেসে গাড়ির দুই সিটের মাঝখানে ড্রিংকস রাখার জায়গাতে রাখা টিকেটের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, এই যে,, টিকেট ওখানেই আছে। ওখানে সব ব্যান্ডের নাম লেখা আছে।

মেয়েটি টিকেট দুটো হাতে নিয়ে বললো, ওয়াও, তোমার কাছে দুটো টিকেট? এই, আমিও তোমার সঙ্গে কনসার্ট দেখবো।

ঘাবড়ে গেলাম। বলে কি মেয়েটি, সর্বনাশ! কোনো *হুকার* (প্রস্টিটিউট) নিয়ে কনসার্ট দেখতে যাবো নাকি? শালা মিলনের জন্য আরেকটা টিকেট কিনে রেখেছিলাম আর এখন মিলন আসেনি বলে হুকারকে নিয়ে কনসার্ট দেখতে যাবো? কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ।

বললাম, না, আসলে টিকেটটি আমার এক বন্ধুর জন্য কেনা। ও আমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে।

ফাক ইওর ফ্রেন্ড। আমার ওজফেস্ট দেখার খুব শখ। আমাকে তোমার নিতেই হবে। নইলে চেচামেচি শুরু করে দেবো।

ভয়ে বললাম, না না, তোমার চেচামেচি করার দরকার নেই। তোমাকে নেবো। তবে কথা হলো কনসার্ট তো অনেক্ষণ স্থায়ী হবে। প্রায় ধরো কম করে হলেও তিন চার ঘণ্টা। প্রতি আধা ঘণ্টায় যদি তুমি একটা করে ব্লো জব দিয়ে একশ ডলার ইনকাম করতে পারো তাহলে একবার চিন্তা করে দেখো তিন চার ঘণ্টায় তুমি কতো ডলার লস খেতে যাচ্ছ?

মেয়েটি বললো, ওহ, কাম অন। দিজ ইজ ওজফেস্ট। আমাকে দেখতেই হবে।

কি আর করা! এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে আরেক বিপদে পড়া যাকে বলে। ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার!

মেয়েটিকে নিয়ে কনসার্ট দেখতে ঢুকলাম। দুজনের পাশাপাশি সিট। একদম কর্নারের দিকে, আইল বরাবর। কনসার্ট আর দেখবো কি! সারাক্ষণই একই ভয়, চেনা-পরিচিত কেউ না দেখলেই হয়। এমন ভাব করতে লাগলাম যেন মেয়েটিকে চিনি না।

তবে মেয়েটিও ভীষণ ত্যাদোড়। দুই মিনিট পর পর আমার গায়ে হাত দিয়ে খাজুরে আলাপ না করলে যেন চলে না।

এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার কয়েক সিট সামনেই বসে আছে দুটো চেনা-পরিচিত মুখ। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখলাম মিলন আর তার স্ত্রী। মনে মনে *শালা* বলে একটা গালি দিলাম। ব্যাটা বৌয়ের সঙ্গেই যখন আসবি তখন খামাখা আমাকে দিয়ে টিকেট কেনালি কেন?

যাই হোক। এখন আমাকে না দেখলেই হয়।

মিলনের স্ত্রী একবার ঘুরে আমাকে দেখামাত্রই আমি অন্যদিকে তাকানোর ভান করলাম। কিন্তু না, সর্বনাশ ততোক্ষণে হয়ে গেছে। দুজনই আমাকে দেখেছে আর পাশের মাগিটা একটু পর পর যে রকম খোচাখুচি করছে আমাকে, মিলন তার স্ত্রীর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, মেয়েটি আমার সঙ্গেই আছে।

অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাদের না দেখার ভান করলাম। তবে বাঙালিরা আবার এসব ব্যাপারে নাছোড়বান্দা। মানুষকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে তা থেকে মজা নেয়াটা আমাদের বাঙালির বহু দিনের পুরনো অভ্যাস।

যা ভাবছিলাম, তাই হলো।

কনসার্টের ব্রেকের সময় মিলন আর তার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলো। যতোই অন্যদিকে তাকিয়ে তাদের চিনি না ভাব করার চেষ্টা করলাম ততোই তারা মুখের মধ্যে হাসি চেপে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

মিলন কাছে এসে বললো, কি রে দোস্ত। তারপর চোখের ইশারা... এমন ভাব যেন, শেষ পর্যন্ত মাগি নিয়ে কনসার্টে আসলি, এতোই তোর অধঃপতন।

মিলনের স্ত্রীর মুখেও চাপা হাসি। বোঝা যাচ্ছে, সহজে এরা ভাগবে না। যতোক্ষণ পারবে আমার বিব্রতকর চেহারা দেখে এরা মজা নেবে।

মিলনের স্ত্রী অনেক কষ্টে যেন তার মিটিমিটি হাসি চেপে রেখে বললো, কি ভাইয়া, কেমন আছেন? আপনার পাশের ওই মেয়েটি কে?

মনে মনে বললাম, বাহ! চমৎকার প্রশ্ন। একেবারে সরাসরি বিব্রত করার জন্য চমৎকার প্রশ্ন।

কালবিলম্ব না করে সরাসরি উত্তর দিলাম, ও হচ্ছে ডায়ানা। ও খুব ভালো ব্লো জব দিতে পারে। প্রতি হাফ অ্যান আওয়ারে একটা করে ব্লো জব দিতে পারে। এই মিলন, তোর যদি কখনো ভালো ব্লো জবের প্রয়োজন হয় তাহলে তুই ডায়ানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিস।

ডায়ানা মাথা নাড়িয়ে হাসি মুখে সম্মতি জানালো।

যা চাইছিলাম তা-ই হলো। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রথমে মিলনের স্ত্রী, তারপর মিলনের হাসি মাখা মুখ পুরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মিলনের স্ত্রী অনেকটা হাত ধরে টান দিয়ে মিলনকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

ঘটনা সেখানে শেষ হলেই ভালো হতো। তবে সেখানে শেষ হলো না। মিলনের স্ত্রীর এখানকার বাঙালি পাড়ায় বিবিসি হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে। তার বদৌলতে বাঙালি পাড়ার অনেকেরই জানা হয়ে গেল আমি হুকার নিয়ে কনসার্ট দেখতে গিয়েছি।

গল্পটা আমার সহকর্মী মাইককে বললাম। তাকে বললাম, দেখো, হোভ লেইন দিয়ে যেতে গিয়ে কি বড় ঝামেলাতেই না পড়লাম।

মাইক আমার কথা শুনে বললো, আ রে, তুমি তো দেখছি মস্ত বোকা। আরে আমিও তো প্রায় হোভ লেইন ব্যবহার করি। তবে এ জন্য কোনো হুকারকে গাড়িতে ওঠাই না। হোভ লেইনে গাড়ি নিয়ে ওঠার জন্য আরেকটা সিসটেম বের করেছি।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, কি সিসটেম সেটা?

মাইক বললো, আমি একটা ব্লোআপ ডল ইউজ করি। ব্লোআপ ডল কি সেটা তো তোমার নিশ্চয় জানাই আছে, নাকি? ওই যে সেক্সের জিনিসপত্র যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে ব্লোআপ ডলও পাওয়া যায়। গাড়িতে উঠলেই একটা ব্লোআপ ডল ফুলিয়ে পাশের সিটে রেখে দিই। দূর থেকে দেখলে মনে হয় প্যাসেঞ্জার। পুলিশ বুঝতে পারে না। সেটা নিয়ে ইচ্ছা মতো হোভ লেইন দিয়ে যাওয়া-আসা করি।

মাইকের কথা শুনে আমার মনে হলো, বাহ, চমৎকার আইডিয়া তো!

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। চলে গেলাম একটা সেক্সুয়াল মেটারিয়াল সেলস সেন্টারে। সেখানে গিয়ে বড়সড় রকমের একটা ব্লোআপ ডল কিনলাম।

দোকানদার আমাকে আরেকটা ব্লোআপ ডল কেনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বললো, এটা সাইজে ছোট। তবে এটার সঙ্গে সেক্স করে তুমি বেশি মজা পাবে।

বললাম, আমি তো সেক্স করার জন্য ব্লো আপ ডল কিনছি না।

দোকানদার অবাক হয়ে বললো, তাহলে কেন কিনছো?

ড্রাইভ করার সময় ওটাকে আমার পাশের সিটে বসিয়ে রাখবো। তাই ব্লোআপ ডল কিনছি।

দোকানদার এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন সে কোনো পাগল দেখছে।

সেই ব্লোআপ ডল নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম। মাইকের কথা মতো ব্লোআপ ডল ফুলিয়ে গাড়ির পাশের সিটে বসে আরাম করে হোভ লেইন দিয়ে যাওয়া-আসা শুরু করে দিলাম।

তবে একটা ছোটখাটো সমস্যা হলো। শহরের বাঙালি পাড়ার অনেকেই আমাকে এখন *সেক্স ক্রেইজি* লোক হিসেবে চেনে। আগেই বলেছি, মিলনের বৌ বাঙালি পাড়ার বিবিসি। তার বদৌলতে ডালাস-এর যেসব চেনা পরিচিত বাঙালি আছে তাদের প্রায় সবাই জেনে গেছে আমি কনসার্টে এক হুকারকে নিয়ে গেছি। তাদের কেউ কেউ এখন আমার গাড়িতে ব্লোআপ ডল দেখে বলতে শুরু করেছে, ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ব্লোআপ ডল নিয়ে ঘোরে? এতোটাই সেক্স ক্রেইজি লোকটা! এতো অধঃপতন। একটা বিয়ে করে ফেললেই তো হয় ইত্যাদি নানান সব প্যাচাল।

অবশ্য এসবে আমার কিছু যায় এসে না। সেসব কথায় কর্ণপাত না করে আরাম করে ব্লোআপ ডলটি নিয়ে হোভ লেইন দিয়ে যাওয়া-আসা করছি। কখনো কোনো ট্রাফিক জ্যামে পড়ছি না। কোনো জায়গায় যেতে আর লেইট হচ্ছে না। এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল।

এরপর এক ঈদের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে পাঞ্জাবি, টুপি পরে গায়ে আতর মেখে বের হলাম ঈদের জামায়াত পড়ার উদ্দেশ্যে। গন্তব্যস্থল ফেয়ার পার্কে। সেখানে ঈদের জামায়াত হবে। আমার বাসা থেকে বেশ দূরে। সকালে তো অফিস আওয়ারে ট্র্যাফিক জ্যাম ভয়াবহ। কিন্তু আমার আর চিন্তা কি? আমার সঙ্গে তো ব্লোআপ ডল আছে। দিব্যি খুশি মনে ফ্ওয়েতে উঠে হোভ লেইন দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করলাম।

ঠিক এমন সময় লক্ষ্য করলাম আমার ব্লোআপ ডলটির কোনো অংশ থেকে যেন বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেটি ছোট হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে বললাম, সর্বনাশ! ব্লোআপ ডল থেকে যদি সব বাতাস বের হয়ে যায় তাহলে তো সেটি একদম ছোট হয়ে যাবে। তখন তো সেটিকে দেখা যাবে না। পুলিশ যদি দেখে আমি একা গাড়ি নিয়ে হোভ লেইন দিয়ে ছুটে যাচ্ছি তাহলে তো বির্ঘাত আমাকে টিকেট দেবে। জরিমানা করে বসবে।

দেরি না করে গাড়িটি হোভ লেইন থেকে বের করে এক সাইডে গিয়ে থামালাম। তারপর প্রথমে ব্লোআপ ডলের ফুটো হয়ে যাওয়া অংশটি ডাকটেপ দিয়ে আটকালাম। এবার ফু দিয়ে সেটিকে বড় করা শুরু করলাম। আমার যে ব্লোআপ ডলটি আছে, সেটির যে অংশ দিয়ে বাতাস ভরতে হয়, অন্য কথা, যে অংশে মুখ দিয়ে ফু দিয়ে বাতাস ভরতে হয় সে অংশটি .. (জ্ঞানী পাঠকরা, বুঝতেই পারছেন, সে অংশটি কোথায়)।

যাই হোক। রাস্তার সাইডে গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় ফু দিতে লাগলাম আর ডলটিও আস্তে আস্তে ফুলতে লাগলো। তখনো ফু দিয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে ডলটি ফুলে তার পা দুটে আমার দু ঘাড় বেয়ে পেছনের দিকে চলে গেল, মাথাটি নেমে গেল আমার তলপেটের নিম্নাঙ্গ বরাবর। ফু দিয়েই চলছি। ঠিক এমন সময় আমার গাড়ির জানালায় টক টক শব্দ শুনতে পেলাম। ব্লোআপ ডলের ও জায়গা থেকে ফু দেয়া বন্ধ করে মাথাটা বের করে পাশে তাকাতেই দেখি পুলিশ।

জানালার কাচ নামাতেই পুলিশ আমাকে বললো, গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো।

গাড়ি থেকে নেমে এলাম।

পুলিশ বললো, তুমি পাবলিক প্লেসে সেক্স অ্যাক্ট করছো, এ জন্য তোমাকে অ্যারেস্ট করবো। পাবলিক প্লেসে সেক্স করা *ক্লাস বি ক্লাসের* দণ্ডনীয় অপরাধ।

আকাশ থেকে পড়লাম। আ রে আমি তো ব্লোআপ ডলটিকে ফুলাচ্ছিলাম। আমি আবার কার সঙ্গে সেক্স করলাম?

কিন্তু অফিসার কোনো কিছুতেই আমার কথা শুনবেন না। বললেন, যা বলার, তুমি কোর্টে গিয়ে বলবে। এখানে কোনো কথা না।

ঠিক এমন সময় একটি গাড়ি এসে একটু সাইড করে থামালো। দেখি মিলনের গাড়ি। সঙ্গে তার স্ত্রীও আছে। তারাও বোধহয় ঈদের জামায়াতেই যাচ্ছিল। আমাকে ততোক্ষণে অফিসার হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে দিয়েছে।

দূর থেকে চেচিয়ে মিলন অফিসারকে বললো, ঘটনা কি অফিসার? ও আমার বন্ধু, ওকে অ্যারেস্ট করছো কেন?

অফিসার বললো, তোমার বন্ধু পাবলিক প্লেসে সেক্স করছিল। তাই ওকে অ্যারেস্ট করছি।

সঙ্গে সঙ্গে মিলন আর মিলনের স্ত্রী বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকালো। চোখের ভঙিতেই বোঝা যাচ্ছে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এতোটাই অধঃপতন তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে তাকালাম।

অফিসার আমাকে টেনে নিয়ে তার গাড়ির ভেতরে ভরছেন। দূর থেকে মিল আর মিলনের স্ত্রী আমার উদ্দেশে চেচিয়ে বললো, *ঈদ মোবারক।*

আমিও বিরস মুখে বললাম, *ঈদ মোবারক।*

অস্টিন, টেক্সাস থেকে

htouhid@yahoo.com

পারিবারিক সাম্য

– অমিত

প্রথম সউদি আসার বছর দেড়েক পরে দেশে ছুটিতে যাই। ছুটিতে গিয়ে নিজের তহবিল থেকে আমার বড় ভাইয়ের এবং ছোট এক বোনের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করি। আমি যেহেতু ভাইদের মধ্যে মেজ, তাই সামনের ছুটিতে আমার বিয়ের পালা হলেও আমি ঘরের কিছু অনিয়ম দেখে বিয়ে করা উপেক্ষা করে পর পর দুই ছুটি কাটিয়ে চলে যাই।

কিছুদিন পরে বড় বোনের চিঠি পাই, মা খুব অসুস্থ এবং ওনার শেষ ইচ্ছা হলো আমাকে বিয়ে করিয়ে আমার বৌ দেখে যাওয়া।

আবারও ছুটিতে যাই এবং আমার জন্য মেয়ে দেখা শুরু হয়। আমার পছন্দের বা ভালো লাগা মেয়ে থাকলেও খামোশ রইলাম একটা কথা ভেবে। আমি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষায় মেধা অনুসারে ষষ্ঠ স্থান দখল করে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই হিসাব বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হওয়ার আশায়। কিন্তু পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে অর্থনৈতিক টানাপোড়ন ও ছোট ছোট ভাইবোনের দিকে চেয়ে ইউনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে আমাকে কর্ম জীবনে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত প্রবাসী হতে হয়। আমার লক্ষ্য হলো পরিবারের সদস্যদের সুখী দেখা।

বড় ভাইয়ের বৌ নিয়ে কেউ সুখে নেই এবং আমার ভয় ছিল যদি আমার পছন্দ করা মেয়ে আনলেও একই পরিণতি হয়! তাই চেয়েছি তারাই আমার জন্য মেয়ে পছন্দ করে আনুক পাছে যেন আমাকে দোষ দিতে না পারে। আমার ছুটি প্রায় অর্ধেক শেষ। মেয়ে ঠিক করতে না পেরে আমার ছোট ভাই, যে খুব পীরভক্ত, প্রস্তাব করে পীর পরিবারেরই একটা মেয়ে খুব সুন্দরী ও সুলক্ষণা যেটার একবার বিয়ে হয়েছে এবং কোনো কারণে ওই বছরেই সে বিয়ে ভেঙে গেছে।

আমার ছুটিও শেষ হয়ে আসছে এবং মাসহ সবার সম্মতি দেখে মানবিক কারণে আমিও হ্যা করি।

যথাসময়ে আমার এবং আমার ছোট এক বোনের বিয়ে এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়। বৌকে মায়ের কাছে রেখে বিরহ নিয়ে বিদেশে চলে যাই। মায়ের অনুমতি সাপেক্ষে সাত মাস পরে আমার নববধূও বিদেশে আমার কাছে আসে।

তারপর যা হওয়ার তাই হলো। আমাদের প্রথম সন্তান জন্ম লাভ করে এবং তার এক বছর বয়সে তাকে নিয়ে আমরা মাকে দেখতে যাই। আমি বৌ, বাচ্চা নিয়ে মায়ের কাছেই অবস্থান করি।

বিদেশ আসার পরে এমনকি বিয়ে করার পরেও আমার টাকা পয়সা ছোট ভাই ও মায়ের কাছে পাঠাতাম। ছুটিতে গেলে তাদের থেকে টাকা নিয়ে আমার খরচ সামলাতাম। তাই আমার হিসাব মতো তাদের কাছে আমার একটা বড় ফান্ড ছিল এবং আমার বিশ্বাস ছিল আমার যখন প্রয়োজন পড়বে তাদের কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে।

এবার বাড়ি এসে মাথায় চিন্তা এলো পরিবারের প্রায় চাহিদা তো পুরো করলাম, এবার নিজের জন্য শহরে একটা জমি কেনার চেষ্টা করি।

যথাসময়ে জমির খবরও পেয়ে যাই এবং ঘরে টাকা চাইতে গেলে জবাব পেলাম, এখন আমাকে কোনো টাকা দেয়া যাবে না। কারণ সব টাকা ছোট ভাই কারবারে লাগিয়েছে।

মনে বড় ধাক্কা লাগে এবং ছোট ভাইকে বলি আমাকে হিসাব দেখাতে তার কাছে আমার কতো টাকা আছে।

সে প্রায় সপ্তাহ খানেক ঘুরিয়ে আমাকে একটা হিসাব দেয়, প্রায় টাকা সংসার খরচে চলে গেছে এবং চার লাখ টাকা সে ব্যবসাতে খাটাচ্ছে।

মাকে বললাম।

মা বললেন, সে কি করতে পারবে, ছোট ভাইকে এতো টাকা কেন দিলাম। তারপরে লক্ষ্য করলাম আমার চাইতেও আমার বৌয়ের প্রতি সবার বৈরী ভাব। তাদের ধারণা এতো দিন তো টাকার হিসাবে চাইনি। বৌ নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেন টাকার হিসাব চাইলাম? এখন সমস্ত দোষ বৌয়ের। কেননা তাদের ধারণা, বৌ আমাকে কুপরামর্শ দিচ্ছে এবং জাদু-টোনা করে বৌয়ের কথা মতো আমাকে চালাচ্ছে।

আমার টাকার জন্য এতো দুঃখ লাগেনি যতোটুকু না লেগেছে আমার সহজ সরল নিরপরাধ বৌকে আক্রমণ করাতে।

অতিষ্ঠ হয়ে বৌকে শ্বশুর বাড়ি রেখে বাকি ছুটি কোনো মতে কাটিয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসি।

চলে আসার পরেও আরো অনেক মিথ্যা বদনাম রটেছে, তাদের থেকে সব কেড়ে নিয়ে আলাদা হয়ে বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছি ইত্যাদি।

দেশেও চুপচাপ ছিলাম এবং বিদেশ এসেও চুপচাপ। মাঝে মধ্যে শুধু মায়ের কাছে কিছু টাকা এবং চিঠি দিতাম।

আবারও যখন ছুটিতে গেলাম দেখলাম সব বেসুরো হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই আমাকে কটাক্ষ করছে। বাধ্য হয়ে বৌকে শ্বশুরবাড়ি রেখে দুই একদিন পর পর মাকে দেখে যেতাম। অনুভব করেছি মাও আমাকে ভুল বুঝতেন। মা মনে করতেন সত্যি সত্যি আমার বৌ বা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে জাদু-টোনা জাতীয় কিছু করেছে। তাই বদলে গেছি। আমার অমঙ্গল কামনায় হয়তো মায়ের মন উচাটন করতো।

এর পরের ছুটিতে গিয়ে মাকে আর দেখিনি। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর সব টাকা পয়সা হারিয়ে ছোট ভাই আবার আমার শরণাপন্ন হয়। এতো কিছুর পরও প্রতিশোধ না নিয়ে আবার তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। তাকে বিয়ে করাই। বড় ভাই, বড় বোনের এক ছেলে এবং ছোট দুই ভগ্নিপতিকে বিদেশ নিয়ে আসি। এখন সবাই আমার এবং আমার বৌয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক। শুধু একটাই দুঃখ, আমার মা দেখে যেতে পারলেন না। হয়তো এ ভুল বোঝাবুঝিই মায়ের অকাল মৃত্যুর কারণ।

এখন আমার বড় বোনের দুই ছেলে বিয়ে করেছে এবং আমার বৌয়ের ছোট দুই ভাইও বিয়ে করেছে। তাদের এবং দেশের প্রায় পরিবারে দেখছি আমার একই সমস্যা। এই সমস্যা প্রকট হলো যারা, বিশেষ করে আমার মতো বৌ নিয়ে বা বৌ ছাড়া বিদেশ থাকে। বিদেশেও লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তানি ও ইনডিয়ানদের মধ্যেও এই সমস্যা বিদ্যমান।

এই সমস্যা পর্যবেক্ষণ করে যা পেয়েছি তা হলো, আমাদের অর্থনৈতিক কারণে একজন উপার্জনকারীর ওপর পরিবারের সবার নির্ভরশীলতা এবং বৌ, সন্তানের প্রতি স্বামীর প্রবল আকর্ষণ যেটা দেখে পরিবারের বাকিরা ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে ওঠে। আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে আমার ধৈর্য, পরিবারের প্রতি আমার কমিটমেন্ট এবং আমার বৌকে আমার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করতে না দেওয়ায়। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে এই সমস্যা গুরুতর হয়ে দাড়িয়েছে।

উপরে উল্লেখ করেছি, এই সমস্যার থেকে বাচতে চেষ্টা করেও পারিনি। যাদের এই সমস্যা নেই তাদের ভাগ্যবান বলবো। আর যারা এর ভুক্তভোগী তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, এটা একটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া কিছুই নয়।

আমার মতো টাকা পয়সার কোরবানি সবাই দিতে না পারলেও ধৈর্য এবং কারো পক্ষ অবলম্বন করে দোষী সাব্যস্ত করার চেয়ে মায়ের বুঝ মাকে এবং বৌয়ের বুঝ বৌকে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি।

বৌকে প্রথম থেকেই এ ধারণা দেয়া উচিত, তার পরিবারের প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কতোটুকু হবে তা নির্ভর করবে তার পরিবারকে বৌ কতোটুকু ভালোবাসে শত ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও।

এই পারিবারিক সাম্যের ওপর নির্ভর করে মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং ছেলেমেয়ের সুনাগরিক হওয়া।

সউদি আরব থেকে

amit2hassan@yahoo.com

টিকেট

– ইমন আহমেদ

তখন কর্মসূত্রে চট্টগ্রামে। ঈদে ঢাকায় আসবো। রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিল অগ্রিম টিকেট ছাড়বে। সে অনুযায়ী তারা শেডিউলও দিয়ে দিল। আসার দিনের আগের দিন অফিসে জানিয়ে দিলাম পরের দিন আসতে দেরি হবে।

সেহরি খেয়ে নামাজ পড়ে বের হয়ে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু সেদিন সকালে শুনলাম আগ্রাবাদে ভোরবেলা ছিনতাই হয়েছে। তাই আর সেই সাহস করলাম না। কারণ এ ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ। তাই পরিকল্পনা পাল্টে ভোর হলে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছয়টার দিকে বের হয়ে সাড়ে ছয়টার দিকে গিয়ে পৌছালাম। আটটা থেকে টিকেট দেবে।

এর আগে আমি কখনো এভাবে টিকেট কাটিনি। ঢাকার বাইরে একা থাকাও প্রথম। গিয়ে দেখি লাইন স্টেশনের দরজার বাইরে চলে এসেছে। অনেকের কাছে শুনলাম, তারা আগের দিন রাত দশটা থেকে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে আছেন। স্টেশনেই সেহরি করেছেন।

আটটার দিকে টিকেট দেয়া শুরু হলো। লাইনও কচ্ছপের গতিতে আগাতে শুরু করলো।

এগারোটার দিকে অফিস থেকে মোবাইলে কল এলো কি অবস্থা জানার জন্য, এমডি সাহেব খোজ করছেন। জানালাম এখনো লাইনে।

অবশেষে একটার দিকে কাউন্টারের সামনে পৌছালাম আর তখনই এতো দীর্ঘ সময় লাগার কারণ বুঝতে পারলাম। কাউন্টারে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসা। তিনি চশমা চোখেও ভালো দেখতে পান না।

চট্টগ্রাম–ঢাকা ও ঢাকা–চট্টগ্রাম ফেরত টিকেটই চাইলাম।

ফেরত টিকেট দেয়া হবে না জানিয়ে দিল।

দুপুরের টিকেট চাইলাম, তাও নেই। অগত্যা রাতের চট্টগ্রাম-ঢাকা টিকেটই কাটলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাসায় কল করে টিকেট প্রাপ্তির কথা জানিয়ে দিলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম টিকেট কেটে রাখার জন্যও বলে দিলাম।

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

ahmedfarial@hotmail.com

অবিশ্বাস

- মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন লাবু

পাত্র চাই।

চল্লিশর্ধো নিঃসঙ্গ ধনবান পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। ডিভোর্স অথবা বিপত্নীক হলেও চলবে। সরাসরি যোগাযোগ করুন...।

পত্রিকা হাতিয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম তখন এই বিজ্ঞাপনটি পেলাম।

ধনবান পাত্রী। বয়স যদিও বেশি তবুও তো ধনবান। তাছাড়া পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি। অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলাম। আমি বেকার যুবক। গত বছর জগন্নাথ থেকে মাস্টার্স শেষ করে বসে আছি। প্রতিদিন পত্রিকা দেখা আর সিভি ছাড়া। মাঝে ইন্টারভিউ-এর ডাক। কিন্তু চাকরি আর হয় না। দেশ থেকে কিছু আসে এবং টিউশনি দিয়ে চলে কিছু। এভাবে কি চলা যায়!

আগাগোড়া কিছু না ভেবেই সিদ্ধান্ত নিলাম যোগাযোগ করবো। কিন্তু বয়স এক ফ্যাক্টর হয়ে দাড়ায়। আমার আটাশ বছর চলছে। তাতে কি! বিদেশে তো অহরহ এ রকম বিয়ে হচ্ছে। আমি না হয় দেশে প্রথম চালু করলাম। আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

নির্ধারিত ঠিকানা অনুযায়ী যোগাযোগ করলাম।

আমাকে সময় দেয়া হলো।

সেই সময়ে হাজির হলাম। ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই যিনি দরজা খুললেন, তাকে দেখে অবাক হলাম। চিরন্তন এক বাঙালি নারী। সুতি শাড়িতে নীল পৃন্ট। কমনীয় চেহারা। পরিচয় এবং আগমনের হেতু জানার পর ভেতরে আসতে বললেন।

বসলাম।

পাত্র কে? সরাসরি জিজ্ঞাসা তার।

আমি। সহজ স্বরে উত্তর দিয়ে তিনিই পাত্রী কি না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি মাথা নাড়লেন। এবার তাকে পরিপূর্ণভাবে দেখার পালা। আরো খুটিয়ে দেখলাম।

তিনিও দেখলেন।

তুমি কি জানো, আমার সন্তান হলে সে তোমার বয়সী হতো?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বুঝতে চেষ্টা করলাম তিনি কি বোঝাতে চাইছেন।

তোমার বয়সের পার্থক্য অনেক। আমার বয়স কতো হতে পারে বলে তোমার ধারণা?

পয়তাল্লিশ বছর। বললাম।

না, ঊনপঞ্চাশে আছি।

দেখুন, আমি একজন বেকার। চাকরির চেষ্টা করেও পাচ্ছি না। এ অবস্থায় এটাই হয়তো আমার জন্য ঠিক হবে।

তুমি আমাকে বিয়ে করবে তুমি এখানে চাকরি করবে। তাতে আবেগ থাকবে না, তাই না?

জি না, থাকবে না কেন? কিন্তু...।

তুমি চাকরি চাও, বৌ নয়। দেখো, তোমাকে একটা কথা বলি। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না। তা না হলে এতো দিন নিঃসঙ্গ থাকতাম না। আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ভুল। আবারও ভুল করলাম। তুমি যেতে পারো।

কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার দুঃখ ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে হার মানি।

ফিরে এসে বেশ কয়েকদিন মন খুব খারাপ ছিল। কি দরকার ছিল এভাবে অপমানিত হওয়ার। তবুও কেন জানি তার প্রতি এক ধরনের টান অনুভব করতাম। ভাবতাম আরেকবার যাই। কিন্তু সেদিনের কথা ভেবে আর এগোই না।

হঠাৎ একটা চাকরি হয়ে গেল আমার। বিদেশি কম্পানি। সেলস এক্সিকিউটিভ পদে। ভালোই বেতন দেয়। পায়ের নিচে মাটি পেলাম। অন্তত এই শহরে থাকা তো হবে! বাবা মাকে তো কিছু দিতে পারবো। এ আনন্দটাই বুকের মাঝে খুব কাজ করছে।

অফিসের কাজে এদিক-সেদিক খুব যাওয়া হয়। মাঝে মাঝে তাকে খুব মনে পড়েছে। তবুও যাইনি। এমন সময় কলিগের পাল্লায় পড়ে উত্তরায় এক গেস্ট হাউসে গেলাম। ফরেইন গেস্ট হাউস।

কলিগ ইঙ্গিতে জানালো, এখানে এনজয় করা যায়। এখানে নারী সম্ভোগ সম্ভব।

প্রথমে এ পথে পা বাড়াতে চাইনি। কিন্তু কলিগের চাপে শেষ-মেশ আমার ডিফেন্স ভেঙে পড়লো। গেলাম দোতলায়।

উঠেই দেখি এক সারি চেয়ারে বসে আছে বিভিন্ন বয়সের কিছু নারী, কাস্টমারের অপেক্ষায়।

হঠাৎ চেয়ে দেখি তিনি।

তিনি চোখ তুলে একবার তাকিয়ে আবার পাশের মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়লেন।

তরুণীদের ভিড়ে তিনিই বয়স্কা। আমাকে তার চেনার কথা নয়। কারণ আমি তো ছিলাম অনেক প্রার্থীর মধ্যে একজন।

তাকেই চাইলাম। এক বয়স্ক নারীকে চাওয়ায় কলিগ অবাক!

রুমে গেলাম। তিনি পিছু পিছু এলেন।

আমি চুপ।

তিনিও চুপ।

হঠাৎ তিনি এটাচড বাথরুমে ঢুকে তার শাড়ি ব্লাউজ খুলে এলেন।

তখনো আমি নিষ্ক্রিয়।

তিনি কয়েকবার মৃদু তাড়া দিলেন। বললেন, এখানে সময় মেপে ঘর ভাড়া দিতে হয় তাকে।

আমি এক অদম্য রাগে তাকে পিষে ফেললাম।

প্রচণ্ড ঝড়ের পর তাকে বললাম, আমি নারীদের অবিশ্বাস করি এবং তা আজ থেকে।

তিনি আমাকে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু তার কথা না শুনেই চলে এলাম। জানি না সেটা ক্ষোভে, না অভিমানে?

রাস্তায় হাটতে হাটতে ভাবলাম ফিরে যাই। তার কথা শুনি। কিন্তু পিছু ফিরে আর যেতে ইচ্ছা করলো না। ভাবলাম রহস্য হয়েই থাকুন না তিনি আমার কাছে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

জ্যঁ পল সার্ত্রর জন্ম শতবর্ষ

– খান আনোয়ার হোসেন

বিশ্বের বেশ কয়েকটি নামকরা ও ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ১৯০৫ সাল বিখ্যাত। আমাদের উপমহাদেশে প্রশাসনিক বিভাগ বঙ্গভঙ্গ ওই সালেই হয়েছিল। এরোপ্লেন আবিষ্কার এবং তার ওড়া নিয়ে ওই সালে ইওরোপ

ও আমেরিকায় বেশ তোলপাড় চলছিল। এর আগে ফ্রান্সের স্থানীয় ও জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে গির্জার হস্তক্ষেপ ছিল বা গির্জা ছিল প্রধান নিয়ন্ত্রক। ১৯০৫ সালে গির্জাকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অরি মাতিস, পল শেজান – এসব আর্টিস্টদের নবধারার আর্ট আন্দোলন ১৯০৫ সালে ছিল তুঙ্গে। ১৯০৫ সালে ফরাশি সম্মিলিত শক্তিশালী এক সোশালিস্ট পার্টির জন্ম হয়।

এ বছরটিতেই শতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক ও বিখ্যাত লেখক জ্য পল সার্ত্র (Jean-paul sartre) জন্মগ্রহণ করেন। সেই সুবাদে ২০০৫ সাল সার্ত্রর একশতম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে গত ২১ আগস্ট শেষ হলো ফ্রান্সের বৃহত্তম জাতীয় লাইব্রেরিতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সার্ত্রর জীবনের ওপর এক বিশাল প্রদর্শনী। তার মৃত্যু হয় ১৯৮০–তে। সার্ত্রর মৃত্যুর পচিশ বছর পরে দেশে ও বিদেশে বেশ জাকজমকভাবে পালিত হচ্ছে তার শততম জন্মবার্ষিকী।

মোপার্নাসের কবরস্থানে শায়িত আছেন সার্ত্র। পেছনে রেখে গিয়েছে তার জীবনের দীর্ঘ সময়কালীন সঙ্গী ও তোলপাড় করা দোজিয়েম সেক্স বা দ্বিতীয় সেক্স–এর লেখিকা সিমোন দি বভোয়ার, অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, তার সমসাময়িক সংগ্রামী কমরেড, তার ছাত্ররা, তার মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তার লেখা অমর কার্যাবলী, নাটক, থিয়েটার ও সাড়া জাগানো প্রবন্ধগুলো। নিঃসন্দেহে সার্ত্র ছিলেন একজন বড় মাপের লেখক ও দার্শনিক। কিন্তু তার সঙ্গী সিমন দি বভোয়ারের দোজিয়েম সেক্স সারা বিশ্বে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল এবং যে বইটির আবেদন এখনো যায়নি তার তুলনায় সার্ত্রের কোনো লেখাই এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি কিংবা তার আবেদন এখনো যে দোজিয়েম সেক্স বইটির মতো সম জনপ্রিয়তায় বহমান সেটা বলা চলে না।

তারপরেও সার্ত্র এমন কি রেখে গেছেন, ফ্রান্স তথা সারা বিশ্বে এখনো তার জনপ্রিয়তা অটুট রাখছে?

তার কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীতে তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার রিলে কাঠি তিনি চাপিয়ে দিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে দৌড় এখনো চলছে। তাই এ সংগ্রামী বিশ্বে তার মূল্যবান মতবাদ এখনো জীবন্ত, চিরনতুন ও চলমান। সার্ত্র সারা জীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ঘৃণা করতেন – তা রাষ্ট্রীয় সম্মান, রাষ্ট্রীয় পদ কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্র যেটাই হোক না কেন।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ছিল সার্ত্রর প্রতিদ্বন্দ্বী। তার জীবদ্দশায় অনেক তিক্তকর ঘটনার অবতারণা হয়েছে এ টেলিভিশন নিয়ে। অথচ আজ ফরাশি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের দুই নাম্বার চ্যানেল ও তিন নাম্বার চ্যানেল এই দার্শনিকের ওপর দুটি টেলিফিল্ম তৈরি করছে যা আগামী হেমন্তে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে।

জ্য পল সার্ত্রর জন্ম হয়েছিল এক বিশাল বুর্জোয়া পরিবারে। তার দাদা এবং নানার দুই বংশই ছিল বুর্জোয়া। কিন্তু তিনি একজন বুর্জোয়া হয়েও সাড়া জীবন সংগ্রাম করেছেন আপন সত্তার বিরুদ্ধে। এ রকম আপন সত্তাবিরোধী সংগ্রাম বর্তমান সমাজে বিরল। তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন আপন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়। তাই তিনি তার আদর্শের প্রতি অটল থেকে সমস্ত বুর্জোয়া সমাজটাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন।

১৯৪৬ সালে সার্ত্র তার মতবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন অস্তিত্ববাদকে। সার্ত্র–এর অস্ত্র ছিল থিয়েটার, নাটক ও তার লেখা। তিনি সারা জীবন অফিশিয়াল স্বীকৃতিকে ঘৃণা করে গেছেন। ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বীকৃতি সার্ত্রর কাছে মূল্যহীন ছিল। তিনি এসব পদ মর্যাদা গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই সার্ত্র–কে ফরাশি সর্বোচ্চ খেতাব লেজিয়ো দোনর–এ ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। তার কাছে এ পুরস্কার ব্যক্তি কেন্দ্রিক পোশাকি সম্মান মাত্র। সার্ত্রর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র।

সার্ত্র দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনার কাজ করেছেন। ফ্রান্সের একটি অভিজাত নামকরা প্রতিষ্ঠান *কলেজ দি ফ্রান্স* । ওই প্রতিষ্ঠানের একটি আসন অনেক বিজ্ঞানীর সারা জীবনের তপস্যা হলেও সার্ত্র সেই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্ভুক্ত হতে কখনো রাজি হননি।

ষাটের দশকে ফ্রান্স তার উপনিবেশ এলজেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে। সার্ত্র খুব কড়া ভাষায় এলজেরিয়া–য় নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। ১৯৬০ সালে সার্ত্র, সিমোন দি বভোয়ার, অন্যান্য সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী একশ একুশজন স্বাক্ষর দানকারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জ্য পল সার্ত্র–ই একশ একুশজন স্বাক্ষরকারীর নেতৃত্ব দেন। তারা ফ্রান্সের সঙ্গে এলজেরিয়ার উপনিবেশবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে সরাসরি এলজেরিয়ার পক্ষ নিয়ে দাড়িয়েছিলেন। এর ফল হিসেবে সার্ত্রকে তার বিয়াল্লিশ নাম্বার রু বনাপার্তের বাড়ি থেকে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এরপরেও সার্ত্র নীতি বিচ্যুত হননি। ষাট দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। কোনো ধরনের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের মোহ কোনোদিন তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে সার্ত্র বলেন, বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাচ্যের কোনো বিদ্রোহী লেখক কিংবা পাশ্চাত্যের অনুগত লেখকদের চিহ্নিত করার জন্যেই বরাদ্দ করা হয়।

সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো সার্ত্র খুব একটা ভুল বলেননি। এ জন্য তিনি ১৯৬৪–তে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক নোবেল সাহিত্য পুরস্কারও বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্যারিস, ফ্রান্স থেকে

anwar_hossein_khan@hotmail.com

পিতৃহীনা

– রানা

আমাদের বাড়ি থেকে ওর বাড়ি অর্থাৎ জানুদের বাড়ি তিন কিলোমিটার দূরে। জানুর সঙ্গে আমার কোনোদিনই পরিচয় ছিল না। জানু পড়াশোনা করতো আমার এক আত্মীয় তসলিমার সঙ্গে। প্রায়ই ওরা কলেজে যেতো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে।

একদিন তসলিমার একটা নোটের জন্য তার সঙ্গে জানুদের বাড়ি গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মেয়েটার বাবা নেই। সে তার মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি থাকে।

অন্য একদিন তসলিমাকে ওর বাড়ির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ও আমাকে বিস্তারিত বলে। জানতে পারলাম এই কলেজ পড়ুয়া মেয়েটা যখন ওর মায়ের পেটে তখন তার বাবা তার মাকে ডিভোর্স দিয়ে অন্যত্র বিয়ে করে। তারপর থেকে জানুর মা জানুকে নিয়ে এতোটা বছর পার করে দিয়েছেন।

ভাবতে অবাক লাগে, একটা মানুষ প্রিয়জনের কাছ থেকে কতোটা আঘাত পেলে সারা জীবন একা একা কাটিয়ে দিতে পারে! এ থেকেই ওর মায়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধা বোধ জেগে ওঠে। এভাবেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

ওর সঙ্গে মিশতে গিয়ে বুঝতে পারি সমাজের মানুষগুলো কতোটা তুচ্ছভাবে দেখে শুধু ওর বাবা নেই বলে। সবাই ওর দিকে বাকা চোখে তাকায়। সমাজে যে তাদের একটা অবস্থান আছে তা কেউ মেনে নিতে চায় না। এই দেখে কিছুটা হলেও জানুর পাশে দাড়াই।

আমাদের এই সম্পর্ক দেখে অনেকে অনেক কটূক্তি করে। যা একদিন আমার বাবা, মায়ের কানে আসে। বন্ধ হয়ে যায় ওর সঙ্গে চলাফেরা।

ও আরো অসহায় হয়ে পড়ে। জানুর সামাজিক, পারিবারিক অবস্থান আরো নাজুক হয়ে পড়ে।

বয়সে জানু আমার চেয়ে চার বছরের ছোট ছিল। সিদ্ধান্ত নিই বিয়ে করবো। কিন্তু আমাদের বংশের একটা মানুষ পেলাম না যে এই বিয়েতে মত দেবে।

সবার অমতে বিয়ে করলাম। জানি না পৃথিবীর ইতিহাসে এতো সাধারণ বিয়ে হয়েছে কি না! ছিল না কোনো গায়ে হলুদ, মেহেদি, বধূবরণ, বাসর রাত।

তবুও বিয়ে।

একদিন ওকে নিয়ে এলাম ওর শ্বশুরালয়ে। বিয়ের পর শুরু হলো ওর আরেক জীবন। এখানে মেয়েটা পদে পদে হোচট খেয়েছে, কটু কথা শুনতে হয়েছে যা ওর প্রাপ্য ছিল না। মাঝে মধ্যে আমার মনে হতো মেয়েটা এমনি অভাগী, তারপর আবার ওকে আমার জীবনে জড়িয়ে কষ্ট দিচ্ছি।

আজ আমাদের বিয়ের ছয় বছর চলছে। এখন আমাদের সোনার সংসার। এর মাঝে এসেছে আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। আমার বাবা, মায়ের মধ্যমণি আমার জানু। আজ আমার বাবা, মাকে নিয়ে পাচ সদস্যের এক সংসার পেতেছি। জীবনে চাওয়া, পাওয়ার আর হিসাব করি না। শুধু ভাবি একটা পিতৃহীনা মেয়ের পাশে দাড়িয়েছিলাম বলেই আজ খোদা তাআলা আমাকে একটা সুন্দর মনের বৌ ও একটা সোনার সংসার দিয়েছে। হাজার সালাম তাকে।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

মনে রেখো

– ইউনুস

সেলফোন বেজেই চলছে।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শাহীন। কয়টা বাজে? রাত, নাকি দিন?

গত রাতে দাম্মাম এয়ারপোর্টে গিয়েছিল এক বন্ধুকে বিদায় জানাতে। রাতে ঘুম হয়নি। লাঞ্চের পরে বিছানায় যেতে না যেতেই গভীর ঘুম। মাত্র দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম। দুপুরে শাহীন ঘুমায় না। কিন্তু আজ সে চোখ খুলতে পারছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাহীন ঘুম ঘুম ছোখে হ্যালো বললো।

ও পাশ থেকে নারী কণ্ঠ, ভালো আছো? দুপুরে ঘুমের ডিস্টার্ব করলাম, সরি।

শাহীন বললো, অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি ...।

সঙ্গে সঙ্গে নারী কণ্ঠ বললো, চিনতে পেরেছো? আমি রিনি।

মুহূর্তেই শাহীনের ঘুম হাওয়া হয়ে গেল।

তুমি? ভালো আছো? কোথেকে ফোন করছো?

দাম্মাম থেকে। রিনি বললো।

আমার সেল নাম্বার কোথায় পেলে?

কারো কাছ থেকে নিয়েছি। তুমি কি রাগ করছো? রিনি বললো।

রাগ করবো কেন? অনেক খুশি হয়েছি। তবুও তো এতো বছর পরে কেউ আমাকে মনে রেখেছে। শাহীন বললো।

আমরা দুই মাস আগে রিয়াদ থেকে দাম্মাম এসেছি। সেদিন পার্ক হোটেলের অনুষ্ঠানে তোমাকে দেখেছি দূর থেকে। তোমার কবিতা বেশ ভালো লাগলো। সেই আগের মতোই আবৃত্তি করলে। পাশের ফ্ল্যাটের এক ভাবীকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তোমাকে চেনেন। পরে কথা হবে, আমার মেয়ের স্কুলের গাড়ি এসে গেছে।

শাহীনের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। রিনির কথা তো সে ভুলেই গিয়েছিল। অপ্রত্যাশিত রিনির টেলিফোন। এগারো বছর পরে রিনির সঙ্গে কথা হলো। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা।

মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে ওদের পরিচয়। শাহীন তখন ডিগ্রি পরীক্ষার্থী আর রিনি সেকেন্ড ইয়ারে। ওরা এখন একে অপরের খুব কাছে এসেছে।

হঠাৎ করেই রিনির বিয়ে হয়ে গেল।

সারা দিন শাহীনের একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। প্রতিদিন ব্যস্তভাবে কাজ করতে হয়। রাতে ভালো ঘুম হলো না। অতীত স্মৃতি তাকে দূরে, বহু দূরে নিয়ে গেল। শেষ দিন ওকে জড়িয়ে ধরে রিনি অনেক কেঁদেছিল। একজন বেকার যুবকের তখন কি আর করার ছিল!

পরের দিন রিনি ফোনে বললো, এখনো বিয়ে করোনি কেন?

যাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলাম তাকে পেলাম না, তাই। শাহীন বললো।

সে তোমাকে অনেক অনুরোধ করেছিল, তার কোনো দোষ নেই, তাকে ভুল বুঝো না। রিনি কেঁদে ফেললো।

তুমি ভালো আছো রিনি? সুখে আছো তো?

সুখ? সুখ তো আপেক্ষিক ব্যাপার। আমার ভালো দিয়ে তোমার কি হবে? অভিমানের সুরে রিনি বললো।

ওভাবে বলো না, বড় কষ্ট হয়। অনেক স্মৃতি তোমাকে নিয়ে। শাহীন বললো।

থাক, আর বলতে হবে না, আর কষ্ট বাড়াতে চাই না। রিনি বললো।

তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। শাহীন বললো।

বর্ষার দিনে নৌকায় চড়ে অনেক দূরে হারিয়ে যেতাম। এক সন্ধ্যায় দুজনে ভিজে একাকার। তোমার সেই বর্ষার কবিতা আজও কানে বাজে। আহা কি যে সুখ! তুমি বেশ হ্যান্ডসাম হয়েছো। রিনি বললো।

আর তুমি? শাহীন প্রশ্ন করলো।

সন্তানের মা হয়েছি, বুঝতেই পারো আগের মতো আর নেই। কাল কথা হবে। রিনি ফোন ছেড়ে দিল।

ডা. জাহিদের স্ত্রী মুক্তাভাবী ফোন জানালো কাল রাতে তাদের বাসায় ঘরোয়া পার্টির আয়োজন। শাহীনকে অবশ্যই আসতে হবে, কোনো অজুহাত চলবে না। প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের কুশল বিনিময় বা আড্ডার একটা বড় বিনোদন এই ঘরোয়া পার্টি।

মার্চের শেষের দিক। গরম শুরু হয়ে গেছে। শাহীন একটি গৃক কম্পানির অ্যাসিসটান্ট কম্পাউন্ড ম্যানেজার। বাংলাদেশি অনেক পরিবারের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক। যে কোনো অনুষ্ঠানে সে যায়।

রাত নয়টায় শাহীন যখন মুক্তাভাবীর বাসায় পৌছালো তখন ড্রয়িংরুমে বেশ কয়েকটি পরিবার। সকলেই পরিচিত মুখ। বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছে। এই প্রবাসেও রাজনীতির আলোচনায় দেশিরা শীর্ষে।

শাহীনকে দেখে রিনি অবাক। সে হাসবে, না কাদবে ভেবে পেল না। ওর শরীরের রক্ত বরফ হয়ে গেছে। রিনিকে দেখেই মুক্তাভাবীকে শাহীন বললো, ওনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে।

আপনার নাম কি শাহীন? আমার খালাতো বোনের গ্রামে আপনার বাড়ি, তাই না?

জি, ধারনা সঠিক। শাহীন বললো।

রিনি ওর স্বামীর সঙ্গে শাহীনকে পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার। রিনি এবং ওর স্বামীর মধ্যে কোথায় যেন গরমিল লাগছে।

শাহীন পার্টি থেকে চলে আসার সময় রিনি এবং তার স্বামীকে তার ওখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ দিল।

মানুষের জীবন বিচিত্র। রিনির সঙ্গে এভাবে দেখা হবে কল্পনাও করেনি শাহীন। হৃদয় বড় হাহাকার করছে। এতো কাছে রিনি, অথচ অনেক দূরে।

রিনিও কি শাহীনের মতো ভাবছে? ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ইচ্ছা করলেও সব সময় ফোন করা যায় না।

দুই দিন হয়ে গেল, রিনি ফোন করছে না। প্রতিদিন দুপুরে শাহীন অপেক্ষায় থাকে তার প্রিয়জনের কণ্ঠ শোনার জন্য। অপেক্ষার অবসান ঘটায় শাহীনই ফোন করলো।

ইচ্ছা করেই ফোন করিনি। দেখলাম তুমি কি আমাকে মনে করো? জানো, দুই দিন খুব কষ্ট হয়েছে। পরীক্ষা করলাম। তুমি জিতে গেছো। আমার বড় ভালো লাগছে, এখনো তুমি আমাকে মনে রেখেছো। তোমাকে নিয়ে আমার খুব হিংসা হচ্ছে।

কেন?

এখানকার অনেক রূপবতীরা তোমার ভীষণ ভক্ত। তুমি বিয়ে কর লক্ষ্মীটি। আমি খুশি হবো। তোমার জন্য আমার হৃদয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তা তোমাকে কেমনে বোঝাবো। আজও যে তোমাকে ভালোবাসি। রিনি বললো।

এক শুক্রবার দুপুরে বন্ধু মহলের অনেককে নিমন্ত্রণ করেছে শাহীন। ডাইনিং হলে রকমারি খাবারের আয়োজন।

রিনিকে আজ অপরূপা লাগছে। ও এমনিতেই সুন্দরী। অতিথিরা আপ্যায়নে খুশি।

এতো সুন্দর পরিচ্ছন্ন আয়োজন, তুমি কি এখানকার বস নাকি? রিনি জিজ্ঞাসা করলো।

অ্যাসিসটান্ট বস। শাহীন বললো। তবে আমার ওপর আস্থা আছে আমার বসের।

আমার খুব ভালো লাগছে, আমার আপনজনের নিমন্ত্রণে এসেছি। মন চায় তোমার খুব কাছে এসে হাত ধরে কিছু বলি। আমার ভেতরে ঝড় উঠেছে। অনেক বছর আগে এক জ্যোৎস্না রাতে যে ঝড় তুমি উঠিয়েছিলে। রিনি বললো।

তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। শাহীন বললো।

আমার রূপের প্রশংসা তুমি কবিতা, গানে বহুবার শুনিয়েছো।

কিন্তু কি লাভ হলো?

শাহীনের সেলফোন বেজে উটলো আর কথা বলা হলো না।

পরের দিন শাহীনের ফোন পেয়ে রিনি অভিমানের সুরে বললো, তুমি কি হারিয়ে যাও নাকি?

সরি, জরুরি মিটিং ছিল। সেলফোন সঙ্গে ছিল না। শাহীন বললো।

শোনো, আজ সন্ধ্যা ছয়টায় আল খোবার মেরিডিয়ান হোটেলের পেছনে সমুদ্রের পাড়ে আসছি। তুমি ওখানে থেকো। রিনি বললো।

ছয়টা বাজার দশ মিনিট আগেই শাহীন নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির। চমৎকার জায়গা। মোটামুটি লোকের ভিড়। রিনি ওর মেয়ের হাত ধরে আসছে।

শাহীন মিটিমিটি হাসছে।

কাছে এসে রিনি বললো, কেমন আছো?

শাহীন মেয়েটিকে আদর করে কোলে নিল।

দুজনে সমুদ্রের তীর থেকে পাথরে বসে পড়লো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

মৃদু বাতাস বইছে।

মাঝারি সাইজের ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে।

রিনি, আজ কি পূর্ণিমা?

হ্যা, তাই মনে হচ্ছে। এখানে এর আগে দুবার এসেছি। প্রতিবারই তোমার কথা মনে পড়েছে। আজ তুমি আমার পাশেই আছো। বড় ভালো লাগছে। মন চায় সারা রাত এখানে থাকি। কিন্তু না, চলো, যেতে হবে। রিনি বললো।

গড়িতে বসেই রিনি এক নজরে শাহীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

শাহীন বললো, কি দেখছো?

রিনি কিছুই বললো না। ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

কয়েকদিন পরে রিনিকে যে খবর দিল শাহীন তা শোনার জন্য রিনি মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

সামনের মাসে আমি গৃসে চলে যাচ্ছি। শাহীন বললো।

রিনি কান্না জুড়ে দিল।

অনেক বছর পরে তুমি কাছে এসেছিলে আবার সেই দূরেই চলে যাচ্ছো। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে শাহীন। কোনোদিন বোঝানি, বুঝবেও না। যেখানেই থাকো, ভালো থেকো, মনে রেখো। রিনি ফোন ছেড়ে দিল।

সউদি আরব থেকে

মুখোশ

– জমির

যায়যায়দিন-এর গত *ঈদ* সংখ্যায় পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছিলাম প্রথম প্রবাস জীবনের অন্য রকম অনুভূতির কথা। বিশ্ব সংস্কৃতির মহা সম্মেলন ঘটে এখানে। তাই জীবনযাত্রা অত্যন্ত গতিশীল হলেও বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। সেই বৈচিত্রের কিছু খণ্ডিত চিত্র ছিল সেই লেখাতে।

এবারকার ঈদ সংখ্যার ঘোষণা পেয়ে ভাবলাম এই এক বছরে আমার এবং এখানে গড়ে ওঠা আমার ছোট্ট পৃথিবীর কয়েকজন সদস্যের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা জানাবো। আগেই বলে রাখছি, প্রতিটি ঘটনাই তিক্ততা আর হতাশার মোড়কে ঘেরা। টেননিকাল কারণে চরিত্রগুলোর পুরো নাম ব্যবহার না করে নামের একটা অংশ ব্যবহার করলাম।

এক. ফাইজুলভাই। দেশে একটি স্বায়ত্তশাসিত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে মাঝারি ধরনের কর্মকর্তা ছিলেন। যাথানিয়মে অন্যান্য সৎ অফিসারদের মতোই ঘুস, দুর্নীতির সেই বৃত্তে আবর্তন করতে অক্ষম হয়ে সুখের সন্ধানে সপরিবারে কানাডায় মাইগ্রেট করলেন। কিন্তু ল্যান্ডিংয়ের পরের দিনই একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তার হলো।

কানাডা ট্রাস্ট বা TD ব্যাংকের টরেন্টো-র একটা ব্রাঞ্চে গিয়েছিলেন একাউন্ট খোলার জন্য। কিউ-তে তিনি সবার আগে, সামনে একজন শাদা চামড়ার লোক, রিসেপশনে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি পেছনে ফিরে তেড়ে এলেন ফাইজুলভাইয়ের দিকে অনেকটা ঘুষি মারার ভঙ্গি করে।

চিৎকার করে বললেন, তুমি এখানে এসেছো কেন? নিজের দেশে ফিরে যাও (Why are you here, go back to your home)।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে আসা ফাইজুলভাই হা করে চেয়ে থাকলেন লোকটার দিকে। কি বলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

লোকটার অগ্নিমূর্তি দেখে রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে (What happened)?

লোকটা বললো, সে উকি দিয়ে আমার সমস্ত ব্যাংক ইনফরমেশন জেনে নিচ্ছে।

রিসেপশনিস্ট বললেন, কিভাবে (How come)?

কারণ রিসেপশন থেকে কিউ-এর অগ্রভাগ কমপক্ষে চার পাচ ফিট দূরে।

এসব লোক আমাদের দেশে সমস্যা সৃষ্টি করছে (These people are making problems in our country)। বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল লোকটা।

দেশে যেখানে অফিসারের গাড়ি থেকে নামলেই দুই তিনজন পিয়ন স্যার স্যার করে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতো, এখানে প্রথম দিনই এমন অভ্যর্থনা পেলে মানুষ কতোটা হতাশ হয় তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য সান্ত্বনা দিয়ে রিসেপশনিস্ট একবার বলেছিলেন, তুমি সিকিউরিটি ডাকতে পারতে।

দুই. হায়দারভাই। আমার এক ইয়ার সিনিয়র তিনি, স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছিলেন ইউএনবি (University of New Brunsweek)-তে। এখানকার বাঙালি কমিউনিটি খুবই ছোট। দুই একটা ইমিগ্রান্ট ফ্যামিলি আর দুই এক ডজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট নিয়ে সুখ-দুঃখে পথচলা। এখানকার

ইউনিভার্সিটিগুলোতে যারা থিসিস স্টুডেন্ট তাদের রুটিন ওয়ার্ক শেষ করে প্রতিদিন বাসায় ফিরতে ফিরতে সাধারণত রাত নটা দশটা বেজে যায়। আবার কখনো কখনো শনিবার, রবিবারেও পূর্ণ উদ্যমে ল্যাবে পড়ে থাকতে হয়।

এ রকম একটা উইকএন্ডে কাজ সেরে বাসায় ফিরলেন তিনি। রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টা তখন। রাস্তাঘাট কিছুটা ফাকা। হঠাৎ দেখলেন একটা বিয়ারের বোতল উড়ে আসছে ওনার দিকে। কিছুটা সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন আর খুজতে লাগলেন প্রক্ষেপণ বিন্দুটা। দেখলেন তারই সামনে দিয়ে অতিক্রমরত গাড়ি থেকে এসেছে এটা এবং এটাকে খুব উপভোগ করছে গাড়িতে অবস্থানরত শাদা ছেলেমেয়েগুলো।

চিন্তা করতে লাগলেন হায়দারভাই, কাকে ছুড়ে মারলো তারা এই বিয়ারের বোতল! তাকে অর্থাৎ মানুষকে, না মানুষের গায়ের রঙকে? কিছু বুঝে ওঠার আগেই চলে গেল ওরা।

তিন. কবীর। আমারই বন্ধু। এক সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছি। ডিভি লটারি জিতে সরকারি চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে মহা সভ্যতার (!) দেশ আমেরিকায়। ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ভর্তি প্রসেসিং চলছে। ফলে বসে না থেকে কিছু একটা করার জন্য একটা অড জব (Odd job)-এ যোগ দেয় সে। এমনি একদিন কাজ শেষে সাবওয়ে ধরে বাড়ি ফেরা।

হঠাৎ একটা মাতাল তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার, চেচামেচি শুরু করলো, সেই পুরনো বয়ান, তুমি এখানে এসেছো কেন ... বাড়ি যাও ... (Why ... come ... go home ...)।

শান্ত প্রকৃতির কবীর কি আর উত্তর করবে? কপালে ছিল মনে করে শান্তভাবে বসে আছে।

এই অসহায়ত্ব দেখে একজন লোক পুলিশ কল করলো এবং পুলিশ মাতালটাকে নিয়ে গেল। বাহ, কি চমৎকার। আমাদের দেশে মানুষ মাল খেয়ে টাল হলে কোনো পিলার–টিলার জড়িয়ে ধরে বাপ বাপ করে আর এখানে দেখছি মাতাল হলেও রেসিস্ট রেসিস্টই থেকে যায় অর্থাৎ চামড়ার রঙ ঠিক চিনতে পারে, *অনেকটা জাতে মাতাল তালে ঠিক*।

চার. আবার সেই ফাইজুলভাই। যদিও নাইন–ইলেভেনের পর আমেরিকা ভ্রমণকারী প্রায় সকলেরই এ ধরনের কম বেশি তিক্ততার শিকার হতে হচ্ছে। কিন্তু ফাইজুলভাইয়ের ভাগ্যটা বোধহয় একটু বেশি খারাপ। নামের সঙ্গে শেখ, মোহাম্মদ, আহমেদ না থাকা সত্ত্বেও বার বার একই ধরনের সমস্যায় পড়লে যে কারোর পক্ষে মানসিকভাবে ভেঙে পড়াটা স্বাভাবিক।

গত সামারে ইউনিভার্সিটিতে ওনার কোর্স ওয়ার্ক না থাকায় নিউ ইয়র্কে অবস্থানরত বোনের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিলেন সপরিবারে। নতুন নিয়মে আমেরিকা ঢুকতে কানাডিয়ান ইমিগ্রান্টদেরও ভিসা ফেস করতে হয়। আর এখান থেকেই ওনার বিপত্তিটা শুরু। ভাবী ও বাচ্চাদের ভিসা ওই দিন মিললেও ওনাকে প্রায় পনেরো বিশ দিন অপেক্ষা করতে হয় তথাকথিত সিকিউরিটি চেক করার নামে।

যাই হোক। তখন তিনি বুঝতে পারেননি সামনে আর কি চেক করা বাকি আছে। এখান থেকে নিউ ইয়র্ক ট্রেন জার্নিটা সবচেয়ে মনোরম। আরামদায়ক সময়ও কাটাচ্ছিলেন ওনারা। কিন্তু সীমান্তে পৌছার পর ট্রেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। মারাত্মক সব অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত তারা। মনে হচ্ছে তিনি তোরাবোরো পাহাড়ের গুহা থেকে মি. *প্রবলেম*–কে বের করে আনবে।

হঠাৎ মাইকে শোনা গেল, সৈন্যরা কারো নাম ধরে যেন কিছু ঘোষণা করছে। একটু মনোযোগ দিতেই হিম হয়ে গেলেন ফাইজুলভাই। কারণ ওনার নাম ধরেই তারা ডাকাডাকি করছে। আদ্যপান্ত প্রগতিশীল এ লোকটি উগ্রবাদ তো দূরে থাক, কোনো বাদের সঙ্গে জীবনে কখনো জড়াননি। তাই হিসাব মেলাতে পারলেন না ওরা কেন তাকেই খুজছে।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় পেশ করলেন।

সৈন্যরা তাকে প্রথমে অফিসের নির্জন রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, পরে একটা জিপে তুলে প্রায় বিশ মিনিট রাস্তা অতিক্রম করে আরেকটা সেন্টারে নিয়ে গেল। আঠারো বছর বয়স থেকে এ পর্যন্ত কোথায় থেকেছেন, কখন কেন কোথায় গিয়েছিলেন, কোনো ক্রাইম রেকর্ড আছে কি না, চোদ্দ গুষ্ঠির ইতিহাস উদ্ধার করতে লাগলো তারা।

এদিকে ভাবী আর বাচ্চাদের অবস্থা বলা বাহুল্য। মহিলা সিকিউরিটিরা ভাবীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ভাইয়ের দেয়া তথ্য মেলানোর জন্য।

এভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা চরম মানসিক নির্যাতনের পর অনেকগুলো সই, আঙুলের ছাপ নিয়ে তারা ওনাকে রেখে গেল।

পুরো দেড় ঘণ্টাই ট্রেনটা শুধু ওনার জন্য অপেক্ষা করছিল অনেকটা মানবতার সাক্ষী স্বরূপ।

অবশেষে নিউ ইয়র্ক পৌছালেন সবাই। এ সমস্ত ঘটনায় যখন চারদিকের সাধারণ মানুষগুলো হা করে ভিকটিমকে দেখে তখন কোনো অপরাধ না করেও নিজেকে মনে হয় ফাসিকাঠের আসামি।

পাচ. সবশেষে আমি মন্ট্রিঅল-এ আসার পর *বার্গার কিংয়ের* এবং ফিশ বার্গার-এর প্রতি একটা আসক্তি জমে গেছে। স্যামন (Salmon) মাছের এই বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর সফট ড্রিংকস মিলে একটা প্যাকেজ ওরা অফার করে যা ওদের ভাষায় *ট্রিও*। দুই এক সপ্তাহ পর পর এ সুস্বাদু খাবারটা না খেলে আমার মাথা ঠিক কাজ করে না।

ঘটনার রাত ছিল রুমমেট-এর প্রথম বিয়েবার্ষিকী যদিও ভাবী এখনো দেশেই অবস্থান করছেন। সবাই মিলে গেলাম বার্গার কিংয়ে। এই সবার মধ্যে আমিও এক জুনিয়র ছিলাম কনফার্মড ব্যাচেলর, দুজন ম্যারেড ব্যাচেলর (ভাবী কাছে নেই) আর আমাদের প্রিয় এক ভাই এবং ভাবী।

আমাদের পর পরই দশ বারোজন টিনএজার গ্রুপ ঢুকলো। দুই তিনজন ছেলেমেয়ে শাদা, বাকিরা আমাদের মতো অর্থাৎ পকিস্তানি, ইনডিয়ান কিংবা শ্রী লংকান হবে। ভাষা থেকে বোঝা গেল এখানেই জন্ম ও বড় হওয়া আর পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি বলছে মূলের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই।

আমরা আমাদের মতো করে খেলাম, আড্ডা দিলাম।

খাওয়া শেষে বাইরে এসে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে দাড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ একটা ক্যারাভান আমাদের অতিক্রম করলো এবং সবাই স্প্রাইটের পানিতে ভিজে গেলাম। অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখলাম ওই গ্রুপটিই। খুব আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছে আমাদের দুর্দশা চিত্র আর দ্রুত লম্বা দিচ্ছে।

কতোক্ষণ এ দেশি কালচারের নিকুচি করে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। স্টুপিডগুলো তিন-চার ব্লক সামনে গিয়ে অন্য রাস্তায় ঘুরে এসে গাড়ি থেকে আবার স্প্রাইটের পানি চূড়লো।

রাস্তার আলোতে গাড়ির নাম্বারটা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মেজাজটা ধরে রাখতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে বা হাতের মধ্যমা উচিয়ে প্রদর্শন করলাম যার অর্থ F ...You ...।

অবশ্য এ দেশে আসার আগে এ জিনিসটা জানতাম না। খারাপ লাগলেও আমরা ওদের খারাপ আচরণগুলোকে নিজের মতো করে নিয়ে নিচ্ছি।

পাচটি ঘটনার ডাইমেনশন ভিন্ন। কিন্তু ধরন একই, সেটা ডিসক্রিমিনেশন বা বর্ণবাদ যা সাংবিধানিকভাবে এখানে নিষিদ্ধ। এদের ভাগ্য ভালো। কারণ এ দেশের পত্রিকাগুলো আমাদের দেশের তথাকথিত জাতির বিবেক (!)দের মতো নেগেটিভ খবরের পেছনে এতো দৌড়াদোড়ি করে না। তা না হলে সার্বক্ষণিক মানব অধিকার সংরক্ষণের জিকির যারা তুলে, প্রচার প্ররোচনায় যারা নিজেদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আইডল বলে দাবি করে কিংবা কোথায় কোন মরু প্রান্তরে কে মানব অধিকার লঙ্ঘন করলো, সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে

ঝাপিয়ে পড়ে তাদের দেশের এ ঘটনাগুলো ঠিক মতো প্রচার পেলে গণ্ডার তো বটেই, মৃত আত্মাও হো হো করে হেসে উঠতো। অনেকটা ক্যাটরিনায় আক্রান্ত কালো মানুষগুলোর দুর্দশার সময় যখন প্রেসিডেন্ট বুশ গিটার বাজাচ্ছিলেন তখন ইরাকে নিহত আমেরিকান সৈন্যদের আত্মা যেমন করে হেসে উঠেছিল সে রকম আর কি?

আফসোস আমাদের সরকারি ও বিরোধী দলের নেতাদের জন্য যারা দেশের যে কোনো ব্যাপারে সার্টিফিকেট আনতে এ মুখোশধারীদের কাছে ছুটে যান।

অনেকে হয়তো বলবেন, *এতো যাতনা সহ্য করে ওই দেশে পড়ে থাকার দরকার কি! দেশে এসে দেশের সেবা করলেই তো হয়?*

দয়া করে এ প্রশ্নটা ওই নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যাদের সেবার (!) কারণে দেশের মেধাবীরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে।

মন্ট্রিঅল, কানাডা থেকে

bangal92@yahoo.com